শিল্প সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার জাতীয় পত্রিকা

গোলাঘর

১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা জুলাই - সেপ্টেম্বর ২০০৯

প্রকাশকাল
১০.১০.২০০৯

সম্পাদক
শওকত হোসেন

নির্বাহী সম্পাদক
শরমিন নিশাত

যোগাযোগ
বাংলাদেশ পথশিল্প সংরক্ষণ ও উন্নয়ন কেন্দ্র
বাড়ি ৩/সি, রাস্তা ১৩/২, জিগাতলা, পশ্চিম ধানমণ্ডি, ৩য় তলা, ঢাকা ১২০৯
মোবাইল ০১৭১৬৪৩৪৪৬৫, ০১৫৫৯১১৩৯৬১, ই-মেইলঃ golaghor@yahoo.com

বানান সমন্বয়
ফরীদুল আলম

প্রচ্ছদ
কাইয়ুম চৌধুরী

পত্রিকার নামলিপি
শরমিন নিশাত

জনসংযোগ
আবদুল হাই

অনলাইন মেকাপ
খোরশেদ রানা

মুদ্রণ
বিকল্প প্রিন্টিং

মূল্য
১১০.০০ টাকা
১১০.০০ রুপি
২ $ ডলার

স ম্পা দ কী য় : এক

প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক 'হালখাতা' তো আছেই, আরেকটি পত্রিকা করার কারণ কী। ...আমি আর শওকত মিলে পত্রিকার কাজ করি; আর আমরা কবিতা লেখা মানুষ; গল্প-উপন্যাস-সিনেমা-নাটক-চিত্রশিল্প-গানের মনোযোগী পাঠক-দর্শক-শ্রোতা। বিষয়ভিত্তিক পত্রিকা হওয়ার কারণে 'হালখাতা'য় এসব থাকে না। সে কারণে 'গোলাঘর' করার সিদ্ধান্ত নিলাম, যার মধ্যে এগুলো কম-বেশি প্রতি সংখ্যাতে থাকবে।

সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ।

নির্বাহী সম্পাদক
০১.০৭.২০০৯

স ম্পা দ কী য় : দুই

মেধাবী বন্ধুদের দেখেছি অনিচ্ছা নিয়ে চাকরিতে যোগ দিতে; চাকরিতে গেলে কবিতা, গল্প, গান হবে না– এই ভয়ে এদের অনেকেই বোহেমিয়ান জীবন বেছে নিয়েছিল। উদ্দেশ্য, সকল কষ্ট মেনে নিয়েও শিল্পের লড়াইটা চালিয়ে যাওয়া। কিন্তু না-খেয়ে তো আর বেঁচে থাকা যায় না, লড়াই তো পরের কথা! বাবা-মা'র সঙ্গে থাকা যাচ্ছিল না, আবার উপযুক্ত কাজ জুটানোও ছিল দায়! এই দ্বন্দ্ব প্রায় সবাইকে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছিল! শেষে টিকে থাকার জন্য যে চাকরি, সেই চাকরিই অনেককে গলাধঃকরণ করল! শিল্প-সাহিত্যের পোড়ো জগতে এদের কারও কারও থাকা হল না।

চাকরির নামে কোনোভাবেই বলি হব না, প্রয়োজনে মরে যাব– এমন প্রত্যয় নিয়ে কাজ শুরু করেছিলাম। অনাড়ম্বর এই সাদা জীবনে কত কষ্ট থাকতে পারে তার শেষ দেখে নেব! ইতোমধ্যে বেশ ক'টা চাকরির বীভৎস রূপ অবশ্য দেখে নিয়েছি!

আর চাকরি নয়; এখন বই পড়া, লেখা-জোখা, পত্রিকা করা আর ঘুরে বেড়ানো! ঘুরে বেড়ানো মানে লন্ডন-মস্কো-দিল্লি নয়, কোলকাতা-কক্সবাজারও নয়; ভরদুপুরে রমনার নির্জন গাছের ছায়ায়, আগার গাঁ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের খোলা মাঠে! ...

এমন মরণমুখি পথের অর্জনই অবশ্য 'হালখাতা'। আত্মীয়রা হতাশ আমাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে, বন্ধুরা অবাক অনিশ্চয়তা দেখে। সেই অনিশ্চয়তাকেই হয়তো আরেকটু বাড়িয়ে দিয়ে এবার করতে যাচ্ছি 'গোলাঘর'। জানি করলে হবে, না করলে হবে না। করছি, হয়তো কিছু হবেই, আর না হলেও আসে-যায় না। সাধ্যমতো চেষ্টা করে যাওয়া, এই আর কি!

শ্রদ্ধাভাজন আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ সম্পাদিত 'আবহমান'-এর সঙ্গে থাকা অবস্থায় কবিতা-গল্পের মধ্যে ছিলাম। 'আবহমান' বন্ধ হওয়ার পর 'হালখাতা' করছি বটে, কিন্তু তাতে ক্ষুধা নিবৃত্ত হয়নি। 'গোলাঘর'-এ শিল্পের সব শাখার উপস্থিতি ঘটবে তাতে ক্ষুধার অনেকটাই নিবৃত্ত হবে– এই আশায় এর যাত্রা শুরু হল। একইসঙ্গে 'হালখাতা'ও তার নিজস্ব গতিতে চলতে থাকবে।

লেখক-পাঠক-সহযোগী সবাইকে জানাই কৃতজ্ঞতা।

সম্পাদক
০১.০৭.২০০৯

সূচি

স্মরণ ০৬

প্র ব ন্ধ

অক্ষয়কুমার দত্তঃ বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচারঃ উৎস এবং বৌদ্ধিক পটভূমি
মু হ ম্ম দ সা ই ফু ল ই স লা ম ০৭

ক বি তা

বেলা শেষের খেলা
আ ল মা হ মু দ ২৬

আমার এতকালের অপাঙ্‌ক্তেয় কবিতাগুলির প্রতি
বে লা ল চৌ ধু রী ২৭

চারটি চৌপদী পদ্য
র বি উ ল হু সা ই ন ২৯

আমার মা
মোহাম্মদ রফিক ৩০

এই দেশ তাঁতিপাড়া থেকে দূরে নয়
কামাল চৌধুরী ৩১

মহাশূন্যের ডালে ডালে ফুল
জাহাঙ্গীর ফিরোজ ৩২

আহাশূন্য, মহাশূন্য!
মঈন চৌধুরী ৩৩

শেয়াল
খোন্দকার আশরাফ হোসেন ৩৪

প্রেতের প্রার্থনা
জুয়েল মাজহার ৩৫

সমুদ্রের স্বপ্ন
মাসুদুল হক ৩৬

ওঠা
চঞ্চল আশরাফ ৩৭

পুরুষের ধর্ম
মুজিব মেহদী ৩৮

প্রকৃতি
শোয়াইব জিবরান ৩৮

আপেল কাহিনী
মজিদ মাহমুদ ৩৯

আমি কোথাও নেই
কুমার চক্রবর্তী ৪০

ঝুঁকি
আলমগীর নিষাদ ৪২

দুধ
ইমরান মাঝি ৪৩

ঝড়ের রাতের গান
ফেরদৌস মাহমুদ ৪৩

আমাদের ইশকুল বাড়ি
কবি অজ্ঞাত ৪৪

প্রকাশিত কবিতার আলোচনা
বিশ্বজিৎ ঘোষ ৪৫

প্রবন্ধ

নাটক: এই সময় সেই সময়
রামেন্দু মজুমদার ৫০

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্যে জীবন ও শিল্পবোধ
সৈয়দ আজিজুল হক ৫৫

ভূমি-ব্যবস্থাপনা ও অর্থনৈতিক মুক্তি
মো. নূরুল আমিন ৬১

গল্প

বহুবার বলা গল্প
শাহ্নাজ মুন্নী ৬৪

পরালালনীল
রাশিদা সুলতানা ৬৮

প্রকাশিত গল্পের আলোচনা
মাসুদুল হক ৮৫

প্রবন্ধ

শহীদুল জহিরের গল্পে সময় ও বিপন্নতার চলচ্চিত্রায়ণ
রহমান হেনরী ৮৮

অনুবাদ কবিতা
লো র না দে সে র ভা ন্তে স / শা ম স আ ল ম মী ন ৯৮

ব ই আ লো চ না
বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ কবিতা! ; শত্রু আত্মীয় চেনার সংকলন
চ ঞ্চ ল আ শ রা ফ ৯৯

স্ম র ণ

....

অক্ষয়কুমার দত্ত

১৮২০ – ১৮৮৬

জন্ম ১৫ জুলাই ১৮২০ বর্ধমানের চুপী গ্রামে। মা দয়াময়ী দেবী, বাবা পীতাম্বর দত্ত। ইশকুলে দু'বছর পড়ার পর বাবা মারা যাওয়ার কারণে ইশকুল ত্যাগ করে কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ত্যাগ করলেও সারাজীবন জ্ঞানের নানা শাখায় চর্চা করেছেন। পাণ্ডিত্য অর্জন করেন বাংলা, ইংরেজি, সংস্কৃত, ফারসি ও জার্মান ভাষায়। বুৎপত্তি অর্জন করেন গণিত, জ্যোতিষ, বিজ্ঞান ও হিন্দুশাস্ত্রে। 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ১৮৪৩ থেকে ১৮৫৫ পর্যন্ত। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্মন্ধ বিচার ১ম ও ২য় খণ্ড, ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায় ১ম ও ২য় খণ্ড, ভূগোল, ধর্মনীতি, প্রাচীন হিন্দুদিগের সমুদ্র যাত্রা ও বানিজ্য বিস্তার, পদার্থবিদ্যা এবং চারুপাঠ ১ম, ২য়, ৩য় খণ্ড।

বিজ্ঞানমনষ্কতা তাঁর রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য। ভারতবর্ষে তখন কার্লমার্কস-এর চিন্তা এসে পৌঁছায়নি; অথচ অক্ষয়কুমার দত্তের সেই সময়ের রচনাতে শ্রেণীভাবনা, সাম্যভাবনা, দান্দ্বিক বস্তুবাদী ভাবনা লক্ষ করার মতো। সেই আমলে তাঁর প্রাসঙ্গিকতা যেমনটি ছিল, আজকের সমাজকেও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর চিন্তা সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। মৃত্যু ১৮ মে ১৮৮৬।

প্র ব ন্ধ

মু হ ম্ম দ সা ই ফু ল ই স লা ম

....

অক্ষয়কুমার দত্তঃ বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচারঃ উৎস এবং বৌদ্ধিক পটভূমি

[এই বালক বাঙ্গলা সাহিত্যের যাহাতে উন্নতি করে এইরূপ শিক্ষাই ইহাকে দিতে হইবে, এইরূপ উদ্দেশ্যে অক্ষয়কুমার দত্তের নাম স্মরণে আমার নামও 'অক্ষয়কুমার' রাখা হয়। হরিনাথই [কাঙাল হরিনাথ মজুমদার] এই নামকরণ করেন এবং তিনিই (অক্ষয়কুমার দত্ত) আমার সাহিত্যপথের গুরু। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়]

অক্ষয়কুমার দত্তের (১৮২০-১৮৮৬)[১] *বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার* (২ খণ্ড , ১৮৫১, ১৮৫৩) গ্রন্থটি বর্তমানে দুস্প্রাপ্য। এ গ্রন্থ ছিল উনিশ শতকের বাঙালি মনীষার ভিত্তিস্বরূপ।[২] গ্রন্থটি কিভাবে বাঙালি মনন ও চেতনাকে সদর্থকভাবে পরিবর্তিত করে, দু-কথায় তার আলোচনা করা বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। প্রবন্ধটি দু-ভাগে বিন্যস্ত করে দেখানো হবে। প্রথমে অক্ষয়কুমার দত্তের গ্রন্থটির উৎস, পরে এর বৌদ্ধিক পটভূমি ও গুরুত্ব।

বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার গ্রন্থটি প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা গদ্য ভাষার একটি মহৎ-দ্বার উদ্‌ঘাটিত হয়। যে-কোনো ভাষার ইতিহাসে গদ্যের এত কাঁচা বয়সে যে এরকম জ্ঞানের বই প্রকাশিত হওয়া সম্ভব এবং তার ভিত্তিও যে বিস্ময়করভাবে মজবুত হতে পাওে অক্ষয়কুমার দত্তের এ গ্রন্থটি তার একটি সর্বাঙ্গসুন্দর দৃষ্টান্ত। বাংলা গদ্য তখনো কৈশোর বয়স অতিক্রম করেনি। কেননা তখনো কোনো শক্তিমান বাঙালি লেখকের হাত দিয়ে বাংলা গদ্যের আদর্শ রূপ (standard prose) তৈরি হয়নি। জ্ঞান-বিজ্ঞানের কোনো আদর্শ গ্রন্থ এর আগে প্রকাশিত হয়নি। এমনকি, সাধারণ জ্ঞানের গ্রন্থেরও দৃষ্টান্ত তখন ছিল না। এরকম নিষ্ফলা মাঠে যে *বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার*-এর মতো একটি জ্ঞানসমৃদ্ধ গ্রন্থ সুশোভিত হয়ে ফলিয়ে ওঠা সম্ভব, অক্ষয়কুমার দত্তের আগে কেউ তা কল্পনাও করতে পারেননি। সম্ভবত তাঁর পরে পঞ্চাশ বছরের মধ্যেও কেউ ভাবেননি। গ্রন্থটি বাংলা গদ্য ভাষার প্রথম যুগের জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রথম নিদর্শন এবং সেটা বাঙালি মনীষার একটা বড়

দৃষ্টান্ত। বাংলা গদ্যভাষা জন্মেই যে সাবালক হয়ে উঠেছিল, এতে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। অক্ষয়কুমার মনে করতেন, যে ভাষায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা হয় না, সে ভাষা দুর্বল। তাঁর এ মনোভাব থেকে জন্ম নেয় এ গ্রন্থ। বিনয়কুমার সরকার এ গ্রন্থ সম্পর্কে যে কথা বলেছেন, তা এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য। তাঁর বৈঠকি ঢঙের কথোপকথনটি এরকম[৩] :

সুবোধ এইবার তাহলে আপনি নিজেই বলুন, 'জ্ঞান ও কর্ম' জাতীয় বাংলা বই আর কখানা আপনি পেয়েছেন?

সরকার ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি বেরিয়েছিল সমাজ-শাস্ত্রী অক্ষয় দত্ত'র

'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' (১৮৫১, ১৮৫৩)। সে বইটা বাঙালির চিন্তা সম্পদের বিপুল খুঁটা।

লেখক কেন? এর বিশেষত্ব কী?

সরকার তাতে ছিল বাঙালি মগজের বস্তু-নিষ্ঠা, যুক্তি-নিষ্ঠা, আর বিজ্ঞান-নিষ্ঠা। কিন্তু

ঘটনাচক্রে সেই বইটা ইংরেজি বইয়ের চুম্বক বা সারসংগ্রহ। লেখক বা অনুবাদক অক্ষয় দত্ত।

লেখক অক্ষয় দত্ত'র রচনাবলী সম্বন্ধে আপনার কী মত?

সরকার তাঁর গদ্য সাহিত্য বাংলা ভাষার উপাদেয় সামগ্রী। তিনি ধর্ম-জীবন নিরেট

বনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠা করবার জন্য বৈজ্ঞানিক ভিত্তি কায়েম করেছিলেন। এই বইটা

তারই সাক্ষী।

লেখক এই ধরনের বই কি সে যুগের আর ছিল না?

সরকার মৃত্যুঞ্জয়-রামমোহন ইত্যাদি যুগে আর তার পরবর্তী বছর পঞ্চাশেকের ভেতর

ঠিক এই দরের চিন্তামূলক এক বিষয়ের বড় বই বাংলায় আমার নজরে পড়ে না। আগেই

বলেছি খোঁজ লওয়া উচিত।

গোপাল হালদার বইটি সম্পর্কে লিখেছেন : জর্জ কুম্ব (George Combe) নামক ইংরেজ লেখকের 'মানুষের গঠন' (Constitution of Man) নামক ইংরেজি গ্রন্থ অবলম্বন করে অক্ষয়কুমারের এ গ্রন্থ রচিত। কিন্তু অক্ষয়কুমার তাতে বিবেচনা অনুযায়ী সংযোজন ও পরিবর্তন যথেষ্ট করেছেন। [...] অক্ষয়কুমারের প্রধান কৃতিত্ব এই যে এসব প্রয়োজনীয় আলোচনায় তিনি বাঙালীকে উৎসাহিত করেছেন, আর বাংলা গদ্যের সেযুগে তিনি এরূপ আলোচনা অনুসৃত করতে পেরেছিলেন। সেদিনের ইংরেজি জানা লোকেরা এ আলোচনা পাঠ করে এর যুক্তিধারায় বিস্মিত হন, যুবকেরা তার নীতিধর্ম দ্বারা প্রভাবিত হন, সেই সূত্রে 'ইয়ং বেঙ্গলের' যুক্তিবাদ উচ্ছৃঙ্খলতা-মুক্ত হয়ে উঠবার সুযোগ লাভ করে, তাঁদের লক্ষ্যই শ্রেয়তর পথে সাধিত হতে থাকে।[৪]

অক্ষয়কুমার দত্তের চিন্তা যে কতভাবে বাঙালি মানসে প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং আধুনিক চিন্তাভাবনার দিকে বাঙালি যুবকেরা যে কত উৎসাহিত বোধ করেছিলেন, বর্তমান আলোচনার ভিতর দিয়ে তা ক্রমশ জানা যাবে। এক্ষেত্রে ভবতোষ দত্তের কথাটিও উল্লেখযোগ্য। তিনি লিখেছেন,

অক্ষয়কুমার দত্ত ছিলেন বাংলা সাহিত্যের প্রথম চিন্তাশীল প্রবন্ধকার যিনি মানুষের জীবন ও অস্তিত্ব নিয়ে ভাবতে শুরু করেছিলেন। দীর্ঘ নিবন্ধে আলোচনা করে তিনি দেখালেন এ জীবন কীভাবে পরিচালিত হয়, বস্তুজগতের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক কি। তাঁর মনে এই জিজ্ঞাসা ও কৌতূহল দেখা দিয়েছিল যে সময়ে, তখন সেটা ছিল অভিনব, কারণ মানবপ্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধ বিচার করার কোনো প্রয়োজন আছে, এ কথা আমাদের দেশে পূর্বে কখনও কারও মনে হয়নি। বরং আমাদের স্মৃতিশাস্ত্র থেকে মনে হয় এ জগৎ অপরিশুদ্ধ, একে নানাভাবে শুদ্ধ করে নিয়ে বাঁচতে হবে। অক্ষয়কুমার দেখালেন বাহ্যজগতের রীতিনিয়মকে যথাযথভাবে জানতে হবে, তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মানুষকে বাঁচতে হবে। এই নীতিনিয়ম স্থির করে মানুষ তার বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে। বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি প্রয়োগ করে মানুষকে সুস্থভাবে জীবনযাপনের আদর্শ নির্ণয় করতে হয়। অক্ষয়কুমার প্রখর যুক্তি প্রয়োগ করলেন বাহ্যজগৎ ও মানবপ্রকৃতির মধ্যে সামঞ্জস্য করতে এবং তার দ্বারাই সুখী হবার পথ নির্দেশ করতে। তার পূর্বে আমাদের দেশে এ চেষ্টা হয়নি। অধ্যাত্ম-সুখের সন্ধান হয়েছে, কিন্তু মানবজীবনের সুখের সন্ধান হয়নি। অবশ্য অক্ষয়কুমার জর্জ কুম্বের বইকে অবলম্বন করেছিলেন। তবে সেটা বিচারহীন অনুবাদ বা অনুকরণ নয়। এই অনুবাদের মূলে ছিল অক্ষয়কুমারের জিজ্ঞাসা মানবজীবন সম্পর্কে।[৫]

এসব বক্তব্যে একটা তথ্য আছে। অক্ষয়কুমার দত্ত তাঁর *বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার* গ্রন্থটি লিখেছিলেন একটি ইংরেজি গ্রন্থকে অবলম্বন করে। অক্ষয়কুমার নিজে এ কথা স্বীকার করেছেন তাঁর বইতে। বইটির প্রথম ভাগের তৃতীয় মুদ্রণের 'বিজ্ঞাপনে' অক্ষয়কুমার লিখেছেন :

শ্রীযুক্ত কুম্ব সাহেব [...] 'কনসটিটিউশন আব ম্যান' নামক গ্রন্থে [...] নিরূপণ করিয়াছেন যে পরমেশ্বরের নিয়ম প্রতিপালন করিলেই সুখের উৎপত্তি হয়, এবং লঙ্ঘন করিলেই দুঃখ ঘটিয়া থাকে। জগদীশ্বর কি প্রকার নিয়মপ্রণালী সংস্থাপন করিয়া বিশ্বরাজ্য পালন করিতেছেন, এবং কোন্ নিয়মানুসারে চলিলে কিরূপ উপকার হয়, এবং কোন্ নিয়ম অতিক্রম করিলে কি প্রকার প্রতিফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, ঐ গ্রন্থে তাহা স্পষ্টরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। ঐ গ্রন্থের অভিপ্রায় সমুদায় স্বদেশীয় লোকের গোচর করা উচিত ও আবশ্যকবোধ হওয়াতে, বাঙ্গালা ভাষায় তাহার সারসঙ্কলনপূর্ব্বক 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' নামক এক এক প্রস্তাব তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। ঐ সমস্ত প্রস্তাব পাঠ করিয়া অনেকেই অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছেন, এবং স্বতন্ত্র পুস্তকে প্রকটিত করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। তদনুসারে, পুনর্ব্বার মুদ্রিত ও প্রচারিত হইতেছে। ইহা ইংরেজি পুস্তকের অবিকল অনুবাদ নহে। যে সকল উদাহরণ ইউরোপীয় লোকের পক্ষে সুসঙ্গত ও উপকারজনক, কিন্তু এদেশীয় লোকের পক্ষে সেরূপ নহে তাহা পরিত্যাগ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে যে সকল উদাহরণ এদেশীয় লোকের পক্ষে সঙ্গত ও হিতজনক হইতে পারে, তাহাই লিখিত হইয়াছে। এদেশের পরম্পরাগত কুসংস্কার সমুদায় মধ্যে উদাহরণ স্বরূপে উপস্থিত করিয়া তাহার দোষ প্রদর্শন করা গিয়াছে। ফলতঃ এতদ্দেশীয় লোকে সবিশেষ মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিয়া তদনুযায়ী ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হন, এই অভিপ্রায়ে আমি এই মানবপ্রকৃতি বিষয়ক পুস্তকখানি প্রস্তুত করিয়া প্রকাশ করিতেছি। তাঁহারা অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক এই মনস্কামনা সিদ্ধ করিলে চরিতার্থ হইব।[৬]

অক্ষয়কুমার দত্তের এ স্বীকৃতির ফলেই জানা যায় যে, *বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার*-এর ভিত্তি ছিল অপর একটি ইংরেজি গ্রন্থ। 'বিজ্ঞাপন'-এ বলে না-দিলে তথ্যটি জানা যেত কিনা সন্দেহ। মহেন্দ্রনাথ রায়ের সাক্ষ্য থেকে এ কথার প্রমাণ মেলে। তিনি বলেন, 'সুশিক্ষিত লোকের মধ্যে দুই চারিজন ভিন্ন অনেকেই কুম্ব সাহেবের পুস্তকের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত জ্ঞাত ছিলেন না। ইঁহার প্রণীত এই বাঙ্গলা পুস্তক প্রচারিত হইলে পরে, তাঁহাদের মধ্যে মূল ইংরেজী গ্রন্থের অনুসন্ধান আরম্ভ হইল। অক্ষয় বাবুকে অনেকের জন্য কুম্ব সাহেবের ঐ গ্রন্থ ক্রয় করিয়া আনিয়া দিতে হইয়াছিল।'[৭] আসলে বইটিতে অক্ষয়কুমার দত্তের নিজস্বতা আর বক্তব্যের অভিনবত্ব এত বেশি ছিল যে, সাধারণ পাঠকের পক্ষে কোনো ইংরেজি গ্রন্থের কথা কল্পনায় আসেনি। আসা সম্ভব ছিল না। এ গ্রন্থ যে অক্ষয়কুমার দত্তের মানসজাত চিন্তার ফসল, তা তাঁর বক্তব্য থেকেই প্রমাণিত। এবং সে কারণে তিনি বহু শ্রম স্বীকার করে এ

গ্রন্থের বিষয় নির্বাচন থেকে শুরু করে, এর বক্তব্য পরিবেশন ও পারিপাট্যের দিকে প্রাণপণে যত্ন করেছেন। গ্রন্থের বক্তব্য তাঁর নিজস্ব বলে ভারতবর্ষীয় লোকের উপযোগী কথা তিনি অত্যন্ত বিবেচনার সঙ্গে সংযুক্ত করেছেন। এবং অনেক স্থানে জর্জ কুম্বের গ্রন্থের অনুবাদ তিনি উদ্ধৃতি চিহ্নের মাধ্যমে উল্লেখ করে দিয়েছেন।[৮] অক্ষয়কুমার জর্জ কুম্বের ও-গ্রন্থ সরাসরি তরজমা করেননি।

আরও যেটা দেখার বিষয়, তা হচ্ছে, সমকালের সমাজঘটিত দুটো বড় সমস্যা তাঁকে যেভাবে বেদনাবিদ্ধ করেছিল যার একটি 'সুরাপান' ও অপরটি 'আমিষভোজন'। এই দুটি বিষয় নিয়ে তিনি স্বাধীনভাবে চিন্তা করেছিলেন এবং দুটি মৌলিক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। সুলিখিত সেই প্রবন্ধ দুটি এ গ্রন্থের দুই ভাগের পরিশিষ্টে সংযোজন করে দিয়েছিলেন। কাজেই *বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার*-এর বক্তব্য যে তাঁর নিজেরই মানসজাত, তাতে সন্দেহ নেই। বলা যেতে পারে, জর্জ কুম্বের গ্রন্থটি অক্ষয়কুমার দত্তের কাছে ছিল সহায়ক গ্রন্থমাত্র। তবে দুজনের মানসিক গড়নে কিছু মিল ছিল। দুজনেই প্রগাঢ় যুক্তিবাদী, প্রাকৃতিক নিয়মের অব্যর্থতায় বিশ্বাসী এবং ইন্দ্রিয়াতীত জগৎ সম্পর্কে বিরূপ। কিন্তু পার্থক্যটাও গুরুত্বপূর্ণ। জর্জ কুম্ব খ্রিস্টধর্মের বিরোধী হয়েও ছিলেন ঈশ্বরবাদী। প্রার্থনা, ভক্তি, উপাসনা প্রভৃতির মূল্য তিনি স্বীকার করতেন। অক্ষয়কুমারের কাছে এসবের কিছুমাত্র মূল্য ছিল না। অক্ষয়কুমার *বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার* গ্রন্থের বক্তব্য কেবল ঐ একটি গ্রন্থেই সীমাবদ্ধ রাখেননি। শিশুপাঠ্য *চারুপাঠ*[৯] এবং *ধর্ম্মনীতি*[১০] গ্রন্থেও তার বক্তব্য গ্রন্থিত করেছেন। এসব কারণে ভবতোষ দত্ত লিখেছেন, '*বাহ্যবস্তু*কে অক্ষয়কুমারের নিজেরই বিশ্বাস এবং অভিমত বলে গ্রহণ করে নিলে ক্ষতি নেই।'[১১] এ বক্তব্যের সঙ্গে আমাদের দ্বিমত নেই।

দুই

এখন দেখা যাক অক্ষয়কুমার দত্তের এই 'অভিমত'-এর ভিত্তি কী এবং তা আদৌ মজবুত কিনা। কিন্তু তার আগে খুব সংক্ষেপে George Combe-এর পরিচয় গ্রহণ করা দরকার। ১৭৮৮ সালে তাঁর জন্ম হয় ব্রিটেনের এডিনবরার একটি শুঁড়ি পরিবারে (brewer family)। মদ প্রস্তুত করা ছিল তাঁর পারিবারিক পেশা। কুম্ব পারিবারিক বৃত্তি গ্রহণ না করে নিজেকে ভিন্ন ভাবে প্রস্তুত করেন। John ven Wyhe-এর একটি প্রবন্ধ থেকে জানা যায়[১২] : Combe attended classes at Edinburgh university from 1802-4. Afterwards he was apprenticed as a clerk to Writers to the Signet (lawyers). George's other brothers became brewers, tanners, a sailor, and a baker. Only his younger brother Andrew followed George in a more ambitious career; Andrew became a physician. With increased social status and secure and promising employment, Combe began to think of the education and learning appropriate for a gentleman. He began to read current literature such as the Edinburgh Review and

authors such as Adam Smith, Malthus, Reid, Dugald Stewart, William Cobbett and to keep a dairy. তবে George Combe-এর জীবন বদলে যায় J. G. Spurzheim-এর সান্নিধ্যে এসে। John ven Wyhe বলেন :

Combe had been in practice as a Writer to the Signet for three years when John Gordon's review of J. G. Spurzheim appeared in 1815. Combe readily mocked Spurzheim's system along with so many other readers of the `literary gospel of Edinburgh'. The chance meeting with Spurzheim changed this and Combe's life.

এই Spurzheim ছিলেন ভিয়েনার বিখ্যাত phrenologist F. J. Gall-এর ছাত্র। Gall মস্তিষ্ক বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করেছিলেন। Spurzheim-এর কাছে Combe এই মস্তিষ্কের বিভিন্ন অঞ্চল ও তার ক্রিয়া সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করেন। এবং phrenologist তত্ত্বে গভীরভাবে বিশ্বাসী হয়ে ওঠেন। ১৮৫৮ সালে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত এ বিদ্যায় তাঁর আস্থা ছিল। ১৮২৮ সালে তাঁর *The Constitution of Man considered in relation to external object* প্রকাশিত হয়। John ven Wyhe-এর তথ্য অনুযায়ী দেখা যায়, উনিশ শতকে ব্রিটেনে যত বই বিক্রি হয়েছে, তার মধ্যে জর্জ কুম্বের বইটি বিক্রি হয়েছে সবচাইতে বেশি। এমনকি এ বইয়ের গুরুত্ব Charles Darwin (1809-1882)-এর বিখ্যাত Origin of Species (1859)-কেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল। কিন্তু যে phrenologist তত্ত্বে জর্জ কুম্ব মেতেছিলেন, এ বইয়ের বক্তব্য সে বিষয়ে নয়। John ven Wyhe কুম্বের বইয়ের বক্তব্য সম্পর্কে বলেন :

Constitution is not a book about phrenology, instead it is a book of natural philosophy which teaches that Man is as subject to natural laws as the rest of Nature—Physical, Organic, and Moral. [...] The first steps towards the good life were to study and obey the distinct natural laws.

অক্ষয়কুমার দত্তও বলেন, 'বিশ্বপতি যে সকল শুভকর নিয়ম সংস্থাপন করিয়া বিশ্ব-রাজ্য পালন করিতেছেন, তদনুযায়ী কার্য্যই তাঁহার প্রিয় কার্য্য; এবং তাঁহার প্রতি প্রীতিপ্রকাশপূর্ব্বক তৎসমুদায় সম্পাদন করাই আমাদের একমাত্র ধর্ম্ম। এ পর্য্যন্ত কতপ্রকার নিয়ম অবধারিত হইয়াছে এবং কি রূপেই বা সে সকল নিয়ম শিক্ষা করিতে সমর্থ হওয়া যায়, তাহা এই পুস্তকে যথাসাধ্য প্রদর্শিত হইল।'[১৩] জর্জ কুম্ব যে ভুল করেছিলেন, অক্ষয়কুমার দত্তও সেই একই ভুল করেন। এখানে ধরে নেয়া হয়েছে এই বিশ্বজগতের একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন। এবং তিনি যে নিয়ম তৈরি করে দিয়েছেন, সে নিয়ম 'শুভকর'। অতএব সে নিয়ম পালন করাই মানুষের কর্তব্য। এই তত্ত্বভিত্তি বিষয়ে দুটো মৌলিক প্রশ্ন উঠে যে প্রশ্ন ভারতবর্ষে সাংখ্য দর্শনের কালে উঠেছিল। প্রথম কথা হচ্ছে, বিশ্বজগতের যে একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন এটা অনুমান মাত্র। এ মতের সপক্ষে উপযুক্ত প্রমাণ নেই। এমনকি এর সপক্ষে যুক্তিগ্রাহ্য প্রমাণ সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত সৃষ্টির সব আজো জানা যায়নি, এবং কবে তা জানা যাবে তা-ও অনিশ্চিত। সুতরাং এই

অসমাপ্ত জ্ঞানের ভিত্তিতে এ কথা বলা বা মানা যায় না যে, সৃষ্টির 'নিয়ম সমুদায়' মানুষের পক্ষে বা অন্য কারুর পক্ষে 'শুভকর'। মানুষের শুভাশুভের সঙ্গে সৃষ্টির নিয়ম-নীতির কোনো সম্পর্ক নেই। মানুষ সৃষ্ট হবার অনেক আগে থেকেই বিশ্বজগৎ আছে এবং মানবপ্রজাতি লুপ্ত হবার পরেও তার থাকার সম্ভাবনা খুব বেশি। বিশ্বজগতে মানুষের উপস্থিতি আকস্মিক (accidental) কিনা, সেটা একটি আধুনিক প্রশ্ন এবং উনিশ শতকের মধ্যভাগে শিক্ষিত মানুষ সম্ভবত সেই প্রশ্নের সম্মুখীন হননি। কিন্তু মানুষের অজ্ঞাত বিশ্ব-সৃষ্টির নিয়ম সমুদায়ের উদ্দেশ্য হল মানুষের মঙ্গলসাধন এই কথা মেনে নিলে সৃষ্টির উপর একটি কল্পিত উদ্দেশ্য আরোপ করা হয় যা শুধু অপ্রমাণিত নয়, প্রমাণের অযোগ্য।'[১৪] অক্ষয়কুমার দত্তের বিচারপদ্ধতি সম্পর্কে এই দার্শনিক আপত্তি আরো অনেকেই তুলেছেন। এবং সে আপত্তি যথার্থ। কিন্তু তার চেয়েও যথার্থ সংবাদ হচ্ছে, *বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার* গ্রন্থের তত্ত্বভিত্তি থেকে পরবর্তীকালে তিনি সরে এসেছিলেন। অক্ষয়কুমার দত্তের *ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়* গ্রন্থে এর প্রমাণ আছে। আমরা এখানে *বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার* গ্রন্থের ঐতিহাসিক গুরুত্ব বিচার করে দেখার চেষ্টা করছি। কেননা অক্ষয়কুমার তাঁর এ গ্রন্থের মাধ্যমে সমকালকে যেভাবে প্রভাবিত করেছিলেন, অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তির মতে অন্যেরা ততটা পারেননি।[১৫]

তিন

বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার গ্রন্থটি উনিশ শতকের বাঙলায় যে নতুন চিন্তার জন্ম দেয়, তার আভাস ইতিমধ্যে আমরা জেনেছি। উনিশ শতকের বাঙলায় বিশেষত, অক্ষয়কুমার দত্তের আগে যে চিন্তাকাঠামো ছিল, *বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার* সেই চিন্তাকাঠামোতে একটি মৌলিক পরিবর্তন নিয়ে আসে। ভবতোষ দত্ত এ ব্যাপারে লিখেছেন : উনিশ শতকে বাঙালির চিন্তায় যে প্রায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল, সাহিত্যে তার প্রথম প্রকাশ অক্ষয়কুমার দত্তের এই বইতে। তার সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মানুষের স্বাধীন স্বাভাবিক বুদ্ধিবৃত্তির প্রচেষ্টা করা, যে বুদ্ধির প্রমাণ প্রাকৃতিক নিয়মতত্ত্বে বিশ্বাস অর্জন। আমাদের মনের জগৎ থেকে সব রকম ধোঁয়াটে ভাব ও অলৌকিক ভাবনাকে দূরীভূত করে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকেই প্রামাণ্য হিসাবে গ্রহণ করা। এই প্রবণতা উনিশ শতকের মনীষীদের চিন্তার সাধারণ প্রকৃতি হয়ে উঠেছিল, অক্ষয়কুমার দত্তেই তার প্রথম অভিব্যক্তি। অক্ষয়কুমার-ব্যবহৃত 'মানবপ্রকৃতি' কথাটা এই নতুন মানবত্ববোধের ইঙ্গিতবহ। অক্ষয়কুমার এমন মানুষের কথা বলেছেন, যার আভাস চণ্ডীদাসের 'সবার উপরে মানুষ সত্য' এই উক্তির মধ্যেও নেই। এই মানুষের কথা বলেই, ব্যক্তির শারীরিক ও মানসিক পর্যায়গুলি বিশদভাবে তিনি বলেছেন। প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসরণেই মানুষের প্রাত্যহিক এবং সামাজিক কর্তব্য করতে হবে ঈশ্বরের ইচ্ছা, স্বর্গলাভের আকাঙ্ক্ষা, শাস্ত্রীয় নিত্যকর্মের অন্ধ অনুষ্ঠানের

কথা তিনি বলেননি। অক্ষয়কুমারের বইটি থেকে আধুনিক মানবধর্মের একটা সূত্র পাই।[১৬]

অক্ষয়কুমার দত্তের বই থেকে উনিশ শতকের মনীষীদের চিন্তার প্রকৃতি যে বদলে যায়, চিন্তাজগতে সেটা একটা বিপ্লব বটে। এবং সেখান থেকেই 'মানবতাবাদ'-এর দিকে বাঙালির চিন্তাভাবনা অগ্রসর হয়। কিন্তু এই 'মানবতাবাদ' কথাটা তখনো সুনির্দিষ্টভাবে কারো রচনাবলীতে দেখা যায় না। পরবর্তীকালে, কথাটা ইংরেজি 'হিউম্যানিজম'-এর তরজমা হিসেবে গৃহীত হয়। কিন্তু এই ধারার চিন্তায় দুটি নতুন শব্দ অক্ষয়কুমার দত্তের রচনাবলীতে প্রথম পাওয়া যায়। এর একটি 'মানবপ্রকৃতি'; ভবতোষ দত্ত ইতিমধ্যে যে শব্দটির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং যা অক্ষয়কুমার দত্তের গ্রন্থের নামকরণে ব্যবহৃত হয়েছে। অপর শব্দটি 'মানবধর্ম'।[১৭] এ শব্দটিও অক্ষয়কুমার দত্তেরই আবিষ্কার। উনিশ শতক পার হয়ে বিশ শতকে এই 'মানবধর্ম' শব্দটি বাঙালি মনীষীদের রচনাবলীতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। শারদীয় পূজা উপলক্ষে হিন্দুসমাজে নানা রকম অনাচার ও কুৎসিত ভাবের আয়োজনও হয়ে থাকে। অক্ষয়কুমার *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়* অক্টোবর ১৮৪৫ সালে সম্পাদকীয় এক প্রবন্ধে শারদীয় উৎসব সম্পর্কে বলতে গিয়ে লিখেছেন :

কি আক্ষেপ! ইহা বিবেচনা করে না, যে যাঁহাকে তাবৎ সংসারের পিতা বা মাতারূপে তাহারা অঙ্গীকার করে, তিনি কি তাহারদিগের কুকর্ম্মে উৎসাহ দিবার নিমিত্তে পক্ষপাত আচরণ করিবেন এবং ন্যায়কে কি অন্যায় করিবেন? এই সকল ব্যক্তি যদি পরমেশ্বরের যথার্থ স্বরূপ জ্ঞাত হইত যদি জানিতে পারিত যে তিনি পূর্ণ জ্ঞান এবং পূর্ণ ন্যায়বান হয়েন রাগ দ্বেষ লোভ পক্ষপাতাদি **মানবধর্ম্ম** হইতে সম্পূর্ণরূপে বিবর্জ্জিত পাপের দণ্ড এবং পুণ্যের পুরস্কার তিনি অনন্যথারূপে বিধান করেন যদি ক্ষমা করেন, তবে তৎকালে, যখন সেই পাপ জন্য আপনার প্রতি অত্যন্ত গ্লানিবোধ করে এবং তাহা হইতে নিবৃত্ত থাকিতে সাবধান হয় এই সমুদয় যদি তাহারদিগের হৃদয়ঙ্গম হইত, তবে তাহারা শাস্তি ভয় প্রযুক্ত দুষ্কর্ম্মে কদাপি মগ্ন হইত না।[১৮]

উনিশ শতকের মধ্যপর্বেই অক্ষয়কুমার বাঙালি মানসে মানবতাবাদের যে দীক্ষা দিয়েছিলেন, তার স্বীকৃতি তাঁর ভাগ্যে জোটেনি। তার কারণ সম্ভবত চণ্ডীদাসের কথাটিকে আজও বাংলা ভাষায় মানবতাবাদের চূড়ান্ত সূত্র হিসেবে বিবেচনা করা হয়। চণ্ডীদাসের ও-কথাটার দু-একটা বৈশিষ্ট্য এরকম : প্রথমত, কথাটা কবিতার ভাষায়; দ্বিতীয়ত, সংক্ষিপ্ত বলে সর্বত্র সবার মুখে মুখে ফেরাও স্বাভাবিক; তৃতীয়ত, সরল মানুষের কাছে তার ব্যাখ্যাও নিষ্প্রয়োজন। কেননা মানুষের বড়ত্ব কোথায় কী অর্থে মানুষ বড়, সরল মানুষের মনে এসব প্রশ্নের উদয়-বিলয় কিছুই হয় না। কতিপয় শিক্ষিত চালাক লোক ধর্মের বাণীর মতো কথাটা আওড়িয়ে সাধারণ মানুষের মনে গেঁথে দিয়ে মানবতাবাদকে বড় করে দেখান, কিন্তু তার কার্য-কারণ-তত্ত্বটা বেমালুম গোপন করে যান। সত্য গোপন করাতে এসব মানুষের মনে যে কোনো রকম গ্লানি নেই,

এটাই তার প্রমাণ। এজন্য ভবতোষ দত্ত পরিষ্কার ভাষায় বলে দিয়েছেন যে, "অক্ষয়কুমার এমন মানুষের কথা বলেছেন, যার আভাস চণ্ডীদাসের 'সবার উপরে মানুষ সত্য' এই উক্তির মধ্যেও নেই।" তার কারণ, অক্ষয়কুমারের বক্তব্যের সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞানের যোগ যত গভীর এবং দৃঢ়, চণ্ডীদাসের কথার সঙ্গে তার যোগ কিছুমাত্র নেই। চণ্ডীদাসের কথা যে ভারতীয় ভাববাদী ধারার মানবতাবাদের সঙ্গে সম্পর্কিত, সেটা অনেক সময় অতি বড় পণ্ডিতও ভুলে যান। অন্নদাশঙ্কর রায় একটি ভিন্ন প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে লিখেছেন :

আমাদের দেশেও এক প্রকার হিউম্যানিজম ছিল। চণ্ডীদাস বলেছিলেন, 'শুনহ মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।' বাউলরা সেই মানুষের সন্ধানে ফেরেন। তাঁদের মতে, 'এই মানুষে আছে সেই মানুষ।' বাউল নারী যোগমায়া আমাকে বলেছিলেন, 'বাবা, এই মানুষই কৃষ্ণ, আর এই মানুষই কংস।'এমনই অনেক উদাহরণ দিয়েছিলেন। তিনি একবারও ঈশ্বরের নাম করেননি। বাউলরা কেউ করেন না। এই যে মানবিকবাদ এর সঙ্গে বিজ্ঞানের কোনো সম্পর্ক নেই। অপরপক্ষে পাশ্চাত্যের মানবিকবাদ বিজ্ঞানের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত। যাঁরা থিয়োলজি বিশ্বাস করতেন না তাঁরা ফিলোজফিকে তার সঙ্গে স্বতন্ত্র করেন। সেই ফিলোজফির এক ভাগের নাম ন্যাচারাল ফিলোজফি, যার অপর নাম সায়েন্স। পরে সায়েন্স বহু শাখাপ্রশাখায় বিভক্ত হয়। পাশ্চাত্য হিউম্যানিস্টরা বৈজ্ঞানিকভাবে চিন্তা করেন।[১৯]

অক্ষয়কুমার দত্তের মানবিকবাদ পাশ্চাত্য মানবিকবাদীদের সঙ্গে তুলনীয়। চণ্ডীদাস কথিত এবং বাউল নারী যোগমায়ার মান্যতা দেওয়া দেশীয় মানবিকবাদীদের সঙ্গে তুলনীয় নয়।

অক্ষয়কুমার দত্তের এই মানবিকবাদ আমাদের দেশে ফলপ্রসূ হতে পারেনি, এমনকি কেউ তা পরিপ্রেক্ষিত সমেত বিস্তারিত আলোচনা করে দেখার গরজও বোধ করেননি। তার কারণ, তাঁর মানবিকবাদ যতটা দায়িত্ব ও পরিশ্রম দাবি করে, আমাদের মানস-চেতনা ততটা উচ্চতা স্বীকার করেনি। এজন্য চণ্ডীদাসের কথাটির যত গুরুত্ব এবং বাউল নারী যোগমায়ার মানবিকবাদ যত প্রচারিত ও জনপ্রিয়, অক্ষয়কুমার দত্তের মানবিকবাদ ততটাই মৃত। এর পেছনে আছে এক গভীর মনস্তাত্ত্বিক কারণ। শশিভূষণ দাশগুপ্ত তাঁর এক প্রবন্ধে বলেন :

ভারতবর্ষের মধ্যে বাঙলাদেশ যেন আবার বিশেষ করিয়া অবতারদের দেশ; এখানে চোখে পড়িবার মতন যিনিই জন্মগ্রহণ করুন, তাঁহাকেই সাক্ষাৎ পূর্ণব্রহ্ম বা আদ্যেশ্বরী ভগবতী না হইয়া উপায় নাই। এখানে মানুষের কোনও দিন মানুষভাবে বড় হইয়া উঠিবার নিয়ম নাই; সত্য-মিথ্যার মিশ্রণে আজগুবি গল্পের সাহায্যে মাতৃগর্ভ হইতেই তাঁহাকে ভগবানের অবতার বানাইয়া তুলিতে না পারিলে আমাদের আর কিছুতেই সোয়াস্তি নাই।[২০] তিনি উক্ত প্রবন্ধে আরও লিখেছেন :

কাহাকেও মানুষ রাখিয়া বড় করিয়া গ্রহণ করিতে গেলে জীবনে তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া মহৎকর্মের ভিতর দিয়া নিজেকে এবং জাতিকে উন্নত করিয়া তুলিবার দায়িত্ব থাকিয়া যায়। কিন্তু তদপেক্ষা আমাদের চিরাচরিত পথে অবতার বানাইয়া কাহাকেও একবার আমাদের সনাতন মন্দিরে ঢুকাইয়া লইতে পারি, তবে ফুল-চন্দন-বিল্বপত্রের নীচে তাঁহাকে সম্পূর্ণভাবে ঢাকিয়া রাখিয়া সকল হাঙ্গামাই চুকাইয়া দিতে পারি।[২১]

এজন্য বুদ্ধ এবং চৈতন্যের মতো রক্ত-মাংসের তাজা মানুষকেও মানুষ হিসেবে গ্রহণ না-করে 'ভগবান' হিসেবে দেখা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে শশিভূষণ দাশগুপ্তের অপর কথাটিও শোনা যেতে পারে। তিনি বলেন :

মানুষকে জীবনে পূজা করিতে হইলে আমাদের জীবনের শ্রমবহুল এবং কষ্টবহুল কর্মপ্রচেষ্টা দ্বারাই তাহা করিতে হয়; তাহার চেয়ে ভক্তি-গদ্‌গদ্‌চিত্তে তাঁহাকে ভগবান করিয়া তুলিতে পারিলে তাঁহার পূজা জিনিসটা অনেক সহজ হইয়া গিয়া আমাদের সকল অস্বস্তিকর দায়িত্বের লাঘব করে; তখন তাঁহার মর্মরমূর্তি বা প্রতিকৃতি গড়িয়া সেখানে ফুল-জল এবং ভোগারতির ব্যবস্থা করিতে পারিলেই কর্তব্য মিটিয়া যায়।[২২]

এদেশের মাটি এমনি মারাত্মক যে দরিদ্র মানুষও তার দারিদ্র্যকে দারিদ্র্যের বেশে প্রকাশ করবার সুযোগ পায় না। কেননা 'দরিদ্র-নারায়ণ' না-হওয়া পর্যন্ত তার নিস্তার নেই। দরিদ্রকেও 'ভগবান' বেশ ধরে মর্তের মাটিতে নামাতে পারলে তবেই দরিদ্রের পরিচয় সার্থক হয়। এসব আবরণ যে মানুষের স্বাভাবিক সত্তাকে বিকৃত করে, সেটা আমরা অনেকে অনেক শিক্ষিত হয়েও বুঝতে চাই না। বুঝতে চাই না যে, 'মানুষ তাহার ইহলোকের চরিত্রবল, শৌর্যবীর্য, কর্মকুশলতা, মহানুভবতা, প্রেম-পবিত্রতা দ্বারা তাহার আজীবন কঠোর সাধনার দ্বারা যতই মহৎ হইয়া উঠুক না কেন, আমরা তাহার মহিমা আবিষ্কার করিতে পারি তখন, যখন তাহাকে অলৌকিক কাহিনীর পরস্পরবিরোধী রঙ মাখাইয়া এমন করিয়া তুলিতে পারি যে, তাহাকে আর মানুষ বলিয়া চিনিবার সাধ্যই না থাকে। অলৌকিকতার ধুস্তুর-বীচির সংযোগ না ঘটিলে আমাদের ধর্মের নেশা আর যেন কিছুতেই জমিয়া উঠে না। ইহাকে জাতিগত চারিত্রিক দুর্বলতা ছাড়া আর কি বলিব?'[২৩] অক্ষয়কুমার দত্তের দর্শন-বিজ্ঞান, নানা চিন্তাভাবনা, বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডের যাবতীয় প্রয়াসের মূলে ছিল এই 'অলৌকিকতার ধুস্তুর-বীচির সংযোগ' থেকে মানুষের মনকে বিচ্ছিন্ন করা, জোড়া-তাড়া দেওয়া নয়। অক্ষয়কুমার বলেন :

নিরবচ্ছিন্ন সুখ হউক দুঃখমাত্র না হউক, ইহা সকলেরই বাসনা, কিন্তু তদ্বিষয়ক কার্য্য-কারণ-ভাবের তথ্য জ্ঞান প্রাপ্ত না হইলে অর্থাৎ আমাদিগের কি প্রকার স্বভাব, অন্য অন্য বস্তুর সহিত তাহার কি প্রকার সম্বন্ধ, ও সেই সম্বন্ধ অনুযায়ী কার্য্যানুষ্ঠানের কি প্রকার উপায় কর্ত্তব্য, এ সমস্ত জ্ঞাত না হইলে সে মনোরথ পূর্ণ হইতে পারে না।[২৪]

এর থেকে বোঝা যায় : অক্ষয়কুমার ব্যবহারিক জগতের অতীত কোনো কিছুর সন্ধান বা চিন্তা করেননি। অস্তিত্ব নিয়ে চরম জিজ্ঞাসা মানুষের চিরকালই ছিল।

ঊনবিংশ শতকে এই জিজ্ঞাসা আমাদের লৌকিক জগতের মধ্যেই উত্তর খুঁজল। য়ুরোপের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এবং প্রাকৃতিক নিয়মের অটল অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হওয়ার ফলে বস্তুজগৎই একটি অবিচল মানদণ্ডে পরিণত হল। এই জগৎ এবং সমাজের স্বতঃসিদ্ধতা মেনে নিয়েই মানববুদ্ধি অগ্রসর হয়েছে। প্রকৃতির রহস্যকে নানা দিক দিয়ে জানা এবং মানুষকে তারই মধ্যে যথাযথরূপে স্থাপিত দেখাই হল তার সব উদ্যমের মূলে। বাংলাদেশে এই জিজ্ঞাসা সর্বপ্রথম দেখা দিয়েছে অক্ষয়কুমার দত্তের মধ্যে। তাঁর আগে যাঁরা এসেছেন, তত্ত্বের দিক দিয়ে মানব অস্তিত্বের কথা তাঁরা চিন্তা করেননি শুধু লোক ব্যবহারের নৈতিক বিচার করেছেন মাত্র। মানব সমাজ এবং বস্তুজগতের মধ্যে ব্যবহারিক সম্পর্ক নির্ণয়ের চেষ্টা আমাদের দেশে আগেও কখনো হয়নি।[২৫]

এই জন্যে অক্ষয়কুমার লিখেছেন : 'পূর্বে আমারদিগের দেশে যত দর্শনশাস্ত্র প্রকাশিত হইয়াছিল, এ বিষয়ের অনুসন্ধান করা তাহার তাৎপর্য্য ছিল না। আপনাদিগের শারীরিক ও মানসিক স্বভাব ও বাহ্য বস্তুর সহিত তাহার সম্বন্ধ বিবেচনা করিবার প্রয়োজন, তৎকালের লোকের সম্যক্ বোধগম্য হয় নাই।'[২৬] অক্ষয়কুমার এখানে যে নিয়মপ্রণালীর কথা বলেছেন, ভারতবর্ষের সমাজব্যবস্থার সঙ্গে তা মেলে না। কিন্তু আঠারো-উনিশ শতকের ইংরেজ 'আমাদের সামনে এনেছে বিশ্ব প্রকৃতিতে কার্যকারণ বিধির সার্বভৌমিকতা; আর একদিকে ন্যায় অন্যায়ের সেই বিশুদ্ধ আদর্শ যা কোনো শাস্ত্র বাক্যের নির্দেশে কোনো চিরপ্রচলিত প্রথার সীমাবেষ্টনে, কোনো বিশেষ শ্রেণীর বিশেষ বিধিতে খণ্ডিত হতে পারে না।'[২৭] রবীন্দ্রনাথের এই বক্তব্যের ভিত্তিতে ভবতোষ দত্ত লিখেছেন : 'অক্ষয়কুমারের রচনায় সেই সার্বভৌমিক নীতি তত্ত্বের আকারে প্রথম স্বীকৃতি লাভ করল। এই স্বীকৃতি আমাদের চিন্তার পদ্ধতিতে নিয়ে এল প্রবল পরিবর্তন এবং দেবেন্দ্রনাথ বেদের অভ্রান্ততায় বিশ্বাস ত্যাগ করলেন।'[২৮] *বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার* দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে যে উদ্ভ্রান্ত করে তুলেছিল, তার প্রমাণ তাঁর রচনাবলীর বহু জায়গায় ব্যাপ্ত হয়ে আছে। প্রত্যক্ষভাবে যেটা লক্ষ করা যায়, সেটা হচ্ছে *বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার* প্রকাশিত হলে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়িতে সকলেই ব্যায়াম করা শুরু করেন। মহেন্দ্রনাথ রায় লিখেছেন : ''এই গ্রন্থে যে শারীরিক নিয়ম পালনের আবশ্যকতা বিশেষরূপে সপ্রমাণ করা হইয়াছে, তৎ-সম্বন্ধে অনেকে গ্রন্থকর্তাকে বলেন, 'আমরা আপনার লিখিত শারীরিক নিয়ম-পালনের বিধানানুসারে ব্যায়াম করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।' *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে* শারীরিক নিয়মাদির বিষয় প্রচারিত হইবার কিছু পরেই শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিজ বাটিতেও অঙ্গ-চালনার এক প্রকার প্রণালী আরব্ধ হয়। তথায় দেবেন্দ্র বাবু, অক্ষয় বাবু, ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি ব্যায়াম অভ্যাস করিতেন।''[২৯] অজিতকুমার চক্রবর্তী বলেন :

ঐ বইটিতে শারীরিক নিয়ম পালনের প্রসঙ্গ পড়িয়া ব্যায়ামচর্চার এক ধূম পড়িয়া যায়। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজের বাড়ীতেই ব্যায়ামের ব্যবস্থা করেন। তিনি নিজে, অক্ষয় বাবু, ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি ব্যায়াম অভ্যাস করিতে লাগিয়া গেলেন। 'বাহ্যবস্তু' গ্রন্থে অক্ষয় বাবু নিরামিষ আহারের পক্ষ সমর্থন করেন; সেই প্ররোচনায় অনেক যুবক নিরামিষ আহার করিতে সুরু করেন। মদ্যপানের অনিষ্টকারিতা সম্বন্ধে তিনি যে আলোচনা করেন, তাহার ফলে রীতিমত একটা Temperance movement বা মদ্যপান নিবারণের আন্দোলন দাঁড়াইয়া যায়। সামাজিক নীতি সম্বন্ধেও ঐ বই পড়ার পরে সমাজে এক আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা যায়। শুনা যায় যে দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়ীতে পুরুষানুক্রমে বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল তাঁহার পিতৃপুরুষেরা সকলেই চল্লিশ পঞ্চাশটি করিয়া বিবাহ করিতেন। অক্ষয় বাবুর বই পড়িয়া তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, কখনই তিনি বহু বিবাহ করিবেন না।[৩০]

কেদারনাথ মজুমদারও এ বিষয়ে লেখেন :

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার যে মাসে অক্ষয় বাবুর *বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার* প্রবন্ধের অন্তর্গত 'শারীরিক নিয়ম পালন বিষয়ক আলোচনা' বাহির হইল, সেই মাসেই উক্ত প্রবন্ধ পাঠ করিয়া বহুলোক নিজ বাসগৃহে ব্যায়ামখানা নির্ম্মাণ করিয়া অঙ্গচালনা করিতে আরম্ভ করিলেন। স্বয়ং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও ব্যায়াম করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।[৩১]

ভবতোষ দত্ত বলেন : "শোনা যায় 'বাহ্যবস্তু' সমসাময়িককালে গভীর এবং সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় [...] কেশবচন্দ্র এবং রাজনারায়ণ বসুর উক্তিতে। এঁরা হিতবাদকে স্বীকার করতে চাননি। ব্রাহ্মধর্ম সুখসন্ধানকে (সুখের অর্থ যতই বিস্তৃত হোক) লক্ষ্য বলে স্বীকার করতে চায়নি; অক্ষম শরীর ও মনের সমঞ্জসীভূত পুষ্টিসাধনকে ব্রাহ্মধর্মের অন্যতম লক্ষ্য বলে না মেনে পারা যায়নি।"[৩২] ভবতোষ দত্ত এখানে কেশবচন্দ্র ও রাজনারায়ণ বসুর যে উক্তির কথা বলেছেন, তা উল্লেখ করা দরকার। কেশবচন্দ্র ১৮৬২ সালে *The Destiny of Human Life* বক্তৃতায় বলেন : This salvation—the soul's progress unto God in faith, purity and love, is to us the grand object of life. But this progress must be of the whole life : we must seek the development of the whole man. All the compartments of life must advance in the way of truth : all the powers and sentiments of the mind must be cultivated and developed.[৩৩]

কেশবচন্দ্রের সঙ্গে ধর্ম ব্যাপারে মতভেদ হলে রাজনারায়ণ বসু রচনা করেন 'ব্রাহ্মধর্মের উচ্চ আদর্শ" (চৈত্র, ১৭৯৬ শক)। এ রচনায় তিনি ব্রাহ্মধর্মের প্রধান লক্ষণ নির্দেশ করেন চারটি অসাম্প্রদায়িকতা, ব্যবধান-বিমুখতা, আধ্যাত্মিকতা এবং সর্বসমঞ্জসীভূততা। চতুর্থ লক্ষণটি এই :

ব্রাহ্মধর্মের প্রধান গৌরব এই যে উহা পরস্পরবিরোধী বৃত্তি ও পরস্পরবিরোধী গুণের সামঞ্জস্য সম্পাদন করিতে অনুজ্ঞা করে। এ বিষয়ে আমার *What is Brahmoism* নামক বক্তৃতায় এইরূপ লিখিত আছে : It considers religious blessedness to consist in a harmonious operation of all our faculties and harmonious discharge of all our duties. It does not consider any quality, faculty, feeling passion or appetite given by God to us unnecessary but maintains that it requires only proper regulation to subserve the temporal and eternal interest of man. From divine communion down to the practise of common prudence and the enjoyment of innocent recreation it considers the exercise of very human faculty under proper regulation and a harmonious discharge of all our duties, duly subordinated for the sake of harmony itself, to be true religion. [৩৪]

অক্ষয়কুমার ব্রাহ্মসমাজকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন যে, 'ব্রাহ্মগণ যে ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে এই পুস্তক অধ্যয়ন ও পুনঃ পুনঃ পর্য্যালোচনা করা তাঁহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য।'[৩৫] ব্রাহ্মসমাজ অক্ষয়কুমার দত্তের এই বক্তব্য গ্রাহ্য করেনি। কিন্তু পাকেপ্রকারে তাঁরা *বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার*-এর কোনো কোনো বক্তব্য গ্রহণ না-করে পারেননি। স্বয়ং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও তাঁর 'আত্মপ্রত্যয়' যে যুক্তির উপর দাঁড় করাতে চেয়েছিলেন, সেটা আসলে অক্ষয়কুমার দত্তের গ্রন্থের প্রভাব। ভবতোষ দত্ত বলেন : দেবেন্দ্রনাথ যখন বেদের অভ্রান্ততায় বিশ্বাস ত্যাগ করে আত্মপ্রত্যয়ের উপর দাঁড়িয়েছিলেন, তখন তিনি যে যুক্তিবাদিতার প্রভাবকে স্বীকার করেছিলেন, সে হচ্ছে অক্ষয়কুমারের। অক্ষয়কুমার যুক্তিকেই যে যুক্তি প্রাকৃতিক নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত, চরম বলে মেনে নিয়েছিলেন কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ প্রাকৃতিক নিয়মের একান্ত নির্ভর ত্যাগ করে আত্মপ্রত্যয় দিয়ে যুক্তিধারা তৈরি করে নিয়েছিলেন। ফলে সেই সময় দুটি দল দেখা দিল একটি দল বিশুদ্ধ যুক্তিপন্থী, আর-একটি দল আত্মপ্রত্যয়বাদী। কেশব এসেছিলেন দ্বিতীয় দলের অনুবর্তন ক'রে। অক্ষয়কুমার অবশ্য ধর্মের দিক দিয়ে জীবন-নীতির কথা চিন্তা করেননি, খাঁটি বৈজ্ঞানিকের মতো প্রাকৃতিক নিয়ম থেকে মানুষের কর্তব্যনীতির সমাধান করেছেন।[৩৬]

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু, কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখ ব্রাহ্মসমাজভুক্ত নেতাদের চিন্তাভাবনা পার করে যখন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের চিন্তাভাবনার দিকে লক্ষ করা যায়, তখন সেখানেও অক্ষয়কুমার দত্তের চিন্তা কার্যকর হতে দেখা যায়। ভবতোষ দত্ত বলেন : বঙ্কিমচন্দ্র চেয়েছেন চিন্তাশক্তিকে জাগাতে। সহজ জ্ঞান বা প্রত্যাদেশের উপর নির্ভর করার বিপজ্জনকতা কোথায় তা তিনি জানতেন। অক্ষয়কুমার দত্তের যুক্তিবাদিতার দীক্ষায় তিনি দীক্ষিত ছিলেন। প্রাকৃতিক নিয়মের ফল তিনি জানতেন; মানুষের অন্তর্জীবনকে যে বাইরের শক্তি প্রভাবিত করতে পারে, এ বিষয়েও তাঁর সংশয় ছিল না। এইজন্য বঙ্কিমের ভক্তিবাদের আলোচনাকে কারও কারও কাছে 'বুদ্ধিবৃত্তির

ক্রিয়া' কিংবা 'অধ্যাত্মদৃষ্টির ক্ষীণতা' বলে মনে হয়েছে। ধর্মতত্ত্বে 'ভক্তি'র বিস্তৃত আলোচনা না থাকলে কী ক্ষতি হত? অক্ষয়কুমারের মধ্যে যে এই দিকটি নেই, তাতে তাঁর চিন্তার কিছু কি মূল্যহানি হয়েছে?[৩৭]

অক্ষয়কুমার *বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার* গ্রন্থে মানুষের সুখের তত্ত্ব দাঁড় করাবার চেষ্টা করেছিলেন। 'এ বিষয়ে অক্ষয়কুমার দত্ত এবং বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে আশ্চর্য সাদৃশ্য আছে। দুজনেই সুখলাভকেই লক্ষ্যস্বরূপ সামনে রেখে বিচারে অবতরণ করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র এই স্বতঃসিদ্ধকে মেনে নিয়ে যুক্তির ক্রমবিস্তারকে স্বীকার্য করে তুলেছেন এবং সুখকে রূপান্তরিত করেছেন বহুজনহিতায়।'[৩৮] অপরদিকে 'অক্ষয়কুমার বহুজনের হিতসাধনকে বলেছেন ধর্মপ্রবৃত্তি। এই ধর্মপ্রবৃত্তি আসে নিয়ম সন্ধানের ফলেই। তিনি প্রকৃতির নিয়ম সন্ধানের দ্বারাই নৈর্ব্যক্তিক হয়ে ওঠার সম্ভাবনার কথা ভেবেছেন। বিজ্ঞান নৈর্ব্যক্তিক। মানুষও এই নিয়ম অনুসরণ করে তদনুযায়ী কর্তব্য নির্ধারণ করবে।'[৩৯] মানুষ যাতে উন্নত জীবন যাপন করতে পারে, তার জন্য অক্ষয়কুমার ব্যবস্থাপত্র দিয়েছিলেন, প্রাকৃতিক নিয়ম জানা এবং তা যথাযথভাবে মেনে চলা এর মধ্য দিয়েই সুখপ্রাপ্তি। অক্ষয়কুমার জানিয়েছেন যে এই সুখপ্রাপ্তির জন্য মানুষের তিনটি নিয়ম জানা দরকার। নিয়ম তিনটি ভৌতিক, শারীরিক ও মানসিক।[৪০] প্রথমটি জড়প্রকৃতির নিয়ম, কার্যকারণ ইত্যাদি; দ্বিতীয়টি মানবশরীরের নিয়ম প্রজনন, বিকাশ এবং মৃত্যু; তৃতীয়টি জীবনচেতনার নিয়ম এ নিয়ম আবার দুরকম মানুষের এবং ইতর জন্তুর। মানুষের মানসিক বৃত্তি সুনির্দিষ্ট, প্রকৃতির এবং বাহ্যবস্তুর সঙ্গে তার সম্বন্ধও নির্দিষ্ট। এগুলো হচ্ছে বুদ্ধিবৃত্তি, ধর্মপ্রবৃত্তি এবং নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি। দেখা যাচ্ছে, অক্ষয়কুমার-কল্পিত এই নিয়ম বিন্যাসগুলোতে অতীন্দ্রিয় বা অধ্যাত্মচেতনা-সম্পর্কিত কিছু নেই। যেখানে তিনি মানসিক প্রকৃতির আলোচনা করেছেন, সেখানে অর্জন-স্পৃহা, লোকানুরাগপ্রিয়তা, সাবধানতা প্রভৃতি কয়েকটি ভক্তিমূলক চেতনার স্থান দিয়েছেন; কিন্তু তাতে 'ভক্তি' কথাটি কেবল শব্দ হিসেবে থেকে গেছে; ভারতবর্ষীয় ভক্তির ধারণায় যে প্রণত আত্মনিবেদন, সেটা হয়ে ওঠেনি। অক্ষয়কুমার দত্তের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মননগত পার্থক্য আছে। তারমধ্যে এ-ও একটি। ভবতোষ দত্ত লিখেছেন :

বঙ্কিমের ধর্মতত্ত্বে ভক্তির স্থান এরকম গৌণ নয়। অবশ্য বঙ্কিমের মতেও ভক্তিকে যেভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে তাতে ভক্তি অর্থ দাঁড়িয়েছে কোনো নৈর্ব্যক্তিক মহৎ আদর্শে অকুণ্ঠ আত্মনিবেদন মাত্র। প্রাকৃতিক নিয়ম সম্পর্কে জ্ঞান বঙ্কিমের কাছে অক্ষয়কুমারের মতোই সমান প্রয়োজনীয়। অক্ষয়কুমারের কাছে তিনটি নিয়ম জ্ঞেয়, বঙ্কিমের কাছে সে তিনটি– ভূত, আমি ও ঈশ্বর। এর প্রথম দুটি অক্ষয়কুমারের নির্দেশেরই অনুরূপ গণিত, জ্যোতিষ, পদার্থতত্ত্ব, রসায়ন, জীবতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব। অক্ষয়কুমার মানসিক নিয়মকে জানবার বিষয় বলেছেন বটে কিন্তু বঙ্কিমের সঙ্গে তার পার্থক্য আছে। হিন্দু দর্শনে মন শরীরেরই অঙ্গ। সুতরাং অক্ষয়কুমারের মানসিক নিয়মও শারীরিক নিয়মের

অন্তর্ভুক্ত হওয়ারই যোগ্য। বঙ্কিম যাকে 'অন্তর্বিষয়ক জ্ঞান' বলেন, সেটা জানা যাবে উপনিষদ দর্শন পুরাণ ইতিহাস, প্রধানত গীতায়। এই বিষয়গুলির সম্পর্কে অক্ষয়কুমারের কোনো উৎসাহ ছিল না, তাঁর অনুসন্ধানের বিষয়ও ছিল না।[৪১]

অক্ষয়কুমার মানুষের সুখ-উৎপত্তির যে তিনটি সূত্র নির্দেশ করেছিলেন, তার ব্যাখ্যায় তিনি বলেন : মনুষ্যের প্রকৃতি ও বাহ্যবস্তুর সহিত তাহার সম্বন্ধের বিষয় সংক্ষেপে বিবরণ করা গিয়াছে। এক্ষণে তাহার সুখোৎপত্তির মূল অন্বেষণ করা যাইতেছে।

প্রথমত : ইহা স্পষ্টই দৃষ্ট হইতেছে, যে শরীর ও মন চালনা না করিলে সুখানুভব হয় না।

দ্বিতীয়ত : সমুদায় মনোবৃত্তিকে পরস্পর সম্পূর্ণরূপ সমঞ্জসীভূত করিয়া চরিতার্থ করা কর্ত্তব্য, নতুবা এ সংসারে যে প্রমাণ স্থায়ী সুখ সম্ভোগের সম্ভাবনা আছে, তাহা সম্পন্ন হয় না।

তৃতীয়ত : মনুষ্যের সুখ স্বচ্ছন্দতাকে বদ্ধ-মূল করিতে হইলে, তাহার সমস্ত মনোবৃত্তি পরস্পর সমঞ্জসীভূত করিয়া যেরূপ উপদেশ প্রদান করে তাহার সহিত বাহ্যবস্তুবিষয়ক নিয়ম সমুদায়ের ঐক্য রাখা আবশ্যক, এবং বুদ্ধি যাহাতে উভয়েরই স্বরূপ ও পরস্পর সম্বন্ধ নিরূপণপূর্ব্বক ভ্রম-প্রমাদ শূন্য হইয়া সৎপথ-প্রবর্ত্তক হইতে পারে তাহার উপায় করা কর্ত্তব্য।[৪২]

অক্ষয়কুমার দত্তের এই সুখ-তত্ত্বের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলন-তত্ত্বের মিল লক্ষ করে ভবতোষ দত্ত বলেন : 'প্রাকৃতিক নিয়মকে জানা আদি প্রয়োজন বলে স্থির করে অক্ষয়কুমার এই জ্ঞান থেকে সুখ কীভাবে লভ্য তাই আলোচনা করছেন। এই আলোচনাতে তাঁর সঙ্গে বঙ্কিমের এবং হিতবাদীদের মিল বিস্ময়কর।'[৪৩] আগেই আমরা দেখেছি যে, এসব মিল দেখেই ভবতোষ দত্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কে বলেন যে, 'অক্ষয়কুমার দত্তের যুক্তিবাদিতার দীক্ষায় তিনি দীক্ষিত ছিলেন।' লক্ষ করা যায়, অক্ষয়কুমার দত্তের প্রাকৃতিক নিয়ম-তত্ত্ব কেবল উনিশ শতকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, বিশ শতকেও সে নিয়ম রাজত্ব করেছে। ভবতোষ দত্ত লিখেছেন :

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী 'নিয়মের রাজত্ব' (১৮৯৯) নামে একটি প্রবন্ধে এটি খুব জোরের সঙ্গেই বলে গিয়েছেন। বস্তুত অক্ষয়কুমার তাঁর 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' বইতে প্রতি পদে যে নিয়মের অমোঘতা এবং সর্ব্বব্যাপিতার বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করেছেন, ঊনবিংশ শতাব্দীর চিন্তাধারার ভিত্তিমূলে তা স্থায়ী হয়ে ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিবিধ প্রবন্ধে'র প্রবন্ধগুলি এবং ধর্মতত্ত্ব বিশ্লেষণ করে দেখলে দেখা যাবে, সর্বত্র নিয়ম দিয়েই সব-কিছু বোঝার চেষ্টা। তাঁর 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধের একটি অধ্যায় ছিল 'প্রাকৃতিক নিয়ম'। ভারতীতে 'প্রকৃতির পরিচায়ক লক্ষণ'(ভাদ্র, অগ্রহায়ণ ১২৯৬) নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।[৪৪]

আমরা আগেই দেখিয়েছি, অক্ষয়কুমার দত্তের প্রাকৃতিক নিয়ম-তত্ত্ব একটি ভুল মতবাদ। কিন্তু ভুল মতবাদ হলেও সমকালে এটা ধরা পড়েনি। কেননা যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের মাধ্যমে ও-তত্ত্বের ত্রুটি ধরা পড়ে, সেটা তখনো পূর্ণতা পায়নি। তাছাড়া উনিশ শতকের বাঙলায় যাঁরা অক্ষয়কুমার দত্তের প্রাকৃতিক নিয়ম-তত্ত্বে আকৃষ্ট হয়েছিলেন, দেখা যায়, তাঁরা সাধারণভাবে কেউই বিজ্ঞানের প্রতি আস্থাশীল ছিলেন না। যে-কথা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতো অত্যন্ত শক্তিমন্ত চিন্তকের সম্পর্কেও খাটে। সম্ভবত, এই কারণে অসিতকুমার ভট্টাচার্য বলেন : "মতবাদ হিসেবে 'জগত্তত্ত্ব' সম্পর্কে এই বিশেষ মত অক্ষয় দত্ত তাঁর 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার'-এ উপস্থিত করেন। পরিণত জীবনে যে তিনি এই মত অতিক্রম করেন, তার প্রমাণ আছে। অক্ষয় দত্তের তিন দশক পরে লেখনী ধারণ করলেও বঙ্কিম এই মতের সীমালঙ্ঘন করতে পারেননি।"[৪৫] কিন্তু অক্ষয়কুমার দত্ত ভারতীয় দর্শনের আলোচনায় *বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার* গ্রন্থের নিয়ম-তত্ত্ব অতিক্রম করেন অতি অনায়াসে। নানা অস্থিরতায় আমাদের গত দুশো বছরের চিন্তার ইতিহাস আমরা পাঠ করিনি। আজ সেটা বড় বেশি প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

তথ্যপঞ্জি

১. অক্ষয়কুমার দত্তের পরিচয়ের জন্য দ্রষ্টব্য : মহেন্দ্রনাথ রায়, বাবু অক্ষয়কুমার দত্তের জীবন-বৃত্তান্ত, কলকাতা

নতুন সংস্কৃত যন্ত্র, ১৮৮২; Asit Kumar Bhattacharya, 'Akshay Kumar Datta : Pioneer of

Indian Rationalism', Rational Annual ,London 1962; Satyendranath Pal. 'Akshay

Kumar Datta', Rise of Redicalism in Bengal in the 19th Century, Calcutta,

Manisha, 1991; Muhammad Saiful Islam (Ed.) Akshaykumar Datta : First Social

Scientist in Bengal, Kokata, Renaissance Publishers Pvt. Ltd. 2008; ***মুহম্মদ* সাইফুল ইসলাম (সম্পা.) বিজ্ঞান-বুদ্ধিচর্চার অগ্রপথিক অক্ষয়কুমার দত্ত ও বাঙালি সমাজ, কলকাতা, রেনেসাঁস**

পাবালিশার্স, ২০০৬; মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম, অক্ষয়কুমার দত্ত ও উনিশ শতকের বাঙলা, ঢাকা, বাংলাদেশ

এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৯।

২. গ্রন্থটি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আছে অক্ষয়কুমার দত্ত ও উনিশ শতকের বাঙলা (২০০৯) গ্রন্থে।

৩. বিনয়কুমার সরকার, বিনয় সরকারের বৈঠকে-২, (হরিদাস মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত), কলকাতা, দে'জ
পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০০৩, পৃ ৫২২
৪. গোপাল হালদার, গোপাল হালদার রচনাসমগ্র-২, কলকাতা, এ মুখার্জী এ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড,
জানুয়ারি ১৯৯৩, পৃ ১৫৭-১৫৮
৫. ভবতোষ দত্ত, বাঙালীর মানবধর্ম, কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি. পৌষ ১৪০৬, পৃ ৪৫
৬. বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার-১, জি.পি. রায় এণ্ড কোম্পনির যন্ত্রালয়, তৃতীয় মুদ্রণ ১৭৭৮
শক, পৃ ১-২
৭. মহেন্দ্রনাথ রায়, শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার দত্তের জীবন-বৃত্তান্ত, কলিকাতা, নূতন সংস্কৃত যন্ত্র, ১২৯২,পৃ১১৭
৮. বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার-২, কলিকাতা, নূতন সংস্কৃত যন্ত্র, সংবৎ ১৯৪৪, ষষ্ঠ অধ্যায় দ্রষ্টব্য
৯. চারুপাঠ -১, 'শারীরিক স্বাস্থ্যবিধান' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য ।

১০. ধর্ম্মনীতি গ্রন্থেও 'শারীরিক স্বাস্থ্যবিধান' প্রবন্ধটি সঙ্কলিত হয়েছে চতুর্থ অধ্যায়ে

১১. ভবতোষ দত্ত, চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র; কলকাতা, প্যাপিরাস, ১৩৯৪, পৃ ৩৮
১২. জর্জ কুম্ব সম্পর্কে এখানকার বক্তব্য কয়টি John ven Wyhe-এর প্রবন্ধ 'The History of phrenology
on the Web', (http:// pages. britishlibrary. net/phrenology/) থেকে গৃহীত। আরো দ্রষ্টব্য
: John ven Wyhe সম্পাদিত Combe's Constitution of Man, and Nineteenth-Century
Responses (Bristol : Thoesmmes Continuum, 2004).

১৩. বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার-২, 'বিজ্ঞাপন', পৃ ৫-৬

১৪. অসিতকুমার ভট্টাচার্য, অক্ষয়কুমার দত্ত এবং উনিশ শতকের বাংলায় ধর্ম ও সমাজচিন্তা, কলকাতা,
কে পি বাগচী এন্ড কোম্পানী, ২০০৭, পৃ ৬৫

১৫. দ্র. দ্বারাকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, নববার্ষিকী, কলকাতা, কলেজ স্কোয়ার রায় প্রেস ডিপজিটরী ১২৮৭, পৃ ১৮৬

১৬. ভবতোষ দত্ত, বাঙালীর মানবধর্ম, পূর্বোক্ত, পৃ ২৬-২৭

১৭. 'আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর' প্রবন্ধে রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত লিখেছেন, 'মানবধর্ম শব্দটি রামেন্দ্রসুন্দরের পূর্বে কেহ
ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া জানি না।' [দ্র. বাঙালি কি আত্মঘাতী ও অন্যান্য রচনা; কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ
বাংলা আকাদেমি, ২০ মে ২০০০, পৃ ১১১] 'মানবধর্ম' শব্দটি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে বর্তমান লেখকের
অক্ষয়কুমার দত্ত ও উনিশ শতকের বাঙলা গ্রন্থের 'বাংলা গদ্যরীতি ও সাহিত্যচিন্তা' অধ্যায়ে।

১৮. তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, 'শারদীয় দুর্গোৎসব', ২৭ সংখ্যা, ১ কার্তিক ১৭৬৭ শক, পৃ ২৩০

১৯. অন্নদাশঙ্কর রায় : 'প্রসঙ্গ শিবনারায়ণ রায়'; মনস্বী বিপ্লবী শিবনারায়ণ রায় (স্বরাজ সেনগুপ্ত
সম্পাদিত), কলকাতা, শিবনারায়ণ রায় অশীতিতম জন্মদিন উদযাপন সমিতি, ২০ জানুয়ারি ২০০১, পৃ ১১

২০. শশিভূষণ দাশগুপ্ত, নিরীক্ষা, কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ, আষাঢ় ১৩৬২, পৃ ১৭৯

২১. পূর্বোক্ত, পৃ ১৭৯

২২. পূর্বোক্ত, পৃ ১৮০

২৩. পূর্বোক্ত, পৃ ১৮১

২৪. বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার–১ পূর্বোক্ত, 'উপক্রমণিকা', পৃ ৪

২৫. চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র, পূর্বোক্ত, পৃ ৩৮-৩৯

২৬. বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার-১, পূর্বোক্ত, 'উপক্রমণিকা', পৃ ১২

২৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কালান্তর, বিশ্বভারতী, কার্তিক ১৩৬৯, পৃ ১৭

২৮. চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র, পূর্বোক্ত, পৃ ৩৯

২৯. মহেন্দ্রনাথ রায়, পূর্বোক্ত, পৃ ১২০-১২১

৩০. অজিতকুমার চক্রবর্তী, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, এলাহাবাদ, ১৯১৬, পৃ ২২৬-২২৭

৩১. কেদারনাথ মজুমদার, বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য-১, কলিকাতা, প্রকাশক নরেন্দ্রনাথ মজুমদার, জুলাই

১৯২৭, পৃ ২৭৯-২৮০

৩২. চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র, পূর্বোক্ত, পৃ ৪১

৩৩. পূর্বোক্ত, পৃ ৩৭

৩৪. পূর্বোক্ত, পৃ ৩৭

৩৫. বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার-২, পূর্বোক্ত, 'বিজ্ঞাপন', পৃ ৫

৩৬. চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র, পূর্বোক্ত, পৃ ৪৭

৩৭. পূর্বোক্ত, পৃ ৪৮

৩৮ পূর্বোক্ত, পৃ ৩৯

৩৯. বাঙালীর মানবধর্ম, পূর্বোক্ত, পৃ ২৫

৪০. বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার-১, পূর্বোক্ত, পৃ ২২

৪১. চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র, পূর্বোক্ত, পৃ ৪০-৪১

৪২. বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার-১, পূর্বোক্ত, পৃ ৬৮-৭৫

৪৩. চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র, পূর্বোক্ত, পৃ ৪১

৪৪. বাঙালীর মানবধর্ম, পূর্বোক্ত, পৃ ২৬

৪৫. অসিতকুমার ভট্টাচার্য, বাংলার নবযুগ ও বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাধারা, কলকাতা, গ্রন্থজগৎ, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি

১৯৬৪, পৃ ১৩১

ক বি তা

০১.

আ ল মা হ মু দ

....

বেলা শেষের খেলা

বেলা শেষের খেলা, আমি খেলছি বটে
কিন্তু তোমার মুখ খানি গো স্মৃতিপটে
তুলছে তুফান ঢেউয়ের মতন কাঁপছে বুকে
দেখছি একটি তিলের চিহ্ন তোমার মুখে
স্মৃতি তো নয় ভীতির মতো তোমার রীতি
একে কি কেউ প্রেম বলে গো, প্রেম পিরিতি?
আমার তো দিন শেষ হয়েছে অন্ধকারে
দাঁড়িয়ে আছি তোমার জন্য বন্ধ দ্বারে
দ্বার খোলো গো খোলো তোমার গোপন কিছু
বহু দূরের পথ হেঁটে যাই তোমার পিছু
এই চলনে পাব কিছু আর ভাবি না
মৃত্যু এসে আমাকে চায় মূল্য বিনা
তবে আমার দাম দেবে কে, লজ্জাহীনা!

১৬. ০৬. ২০০৯

০২.

বেলাল চৌধুরী

....

আমার এতকালের অপাঙ্‌ক্তেয় কবিতাগুলির প্রতি

আমার কবিতা, তোমার ব্যবহারে আমি বিষম দুঃখিত
এ কি ব্যাভার তোমার :
হালফিল যতোটা না তুমি দিয়েছো
জানি, তার চেয়ে ঢের বেশি পাওনা জমেছে তোমার,
কবিতা আমার, তোমার কর্তব্যে তুমি ব্যর্থ হয়েছো,
তুমি আমাকে বিশিষ্ট ক'রে তুলতে পারোনি
এ-জীবনে যদিও তোমার ঢের কাজ ছিলো :
আমার দ্বিধান্বিত পদক্ষেপে সাহস যুগিয়ে
নিখুঁত শব্দছন্দবন্ধে আমার চয়ে ঢের বেশি এগিয়ে যাওয়া;-
কবিতা আমার, তোমার দায়িত্ব ছিলো
আমার প্রতি সবাইকে আকৃষ্ট ক'রে তোলা,
তোমার অস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থক পঙ্‌ক্তির ভেতর
প্রায় রাজকীয় নিশ্চিত-বিজ্ঞের মতো
আমার নিজের হেঁয়ালিভরা মুখের দিকে অন্তত এক ঝলক তাকিয়ে দেখা,
কবিতা আমার, তোমার দায়িত্ব ছিলো
আমার সম্পর্কে মিথ্যাচারণ ও ফোলানো-ফাঁপানো অতিরঞ্জনের,
লক্ষ-লক্ষ পাঠকের শ্রদ্ধার তাপে আমাকে উষ্ণ ক'রে তোলা
কিংবা একের মধ্যে এক লক্ষের
কেন্দ্রীভূত প্রগাঢ় সম্মানের নিচে উজ্জ্বল ক'রে তোলা
আমি জানি আমার শিল্পীভূত মাংস, আমার মৃত্যুকে অতিক্রম ক'রে যাবে
আমার বাস্তবিক বেঁচে থাকাকে
পূরণ করবে আমার ব্যাহত ভালোবাসা
আমার মাথার ভেতরে রত্নভূষণে সজ্জিত এক কুঁজো বাসন
ব'সে-ব'সে বাড়ছে অন্ধকার হাতকাটা গলিতে :
কোনো পুরস্কারে-টুরস্কারে যে কখনো শান্ত হবে না

কিছুটা অন্য রকমের হলেও তার আছে উচ্চাভিলাষ;
আমার কবিতা, তুমি তোমার স্রষ্টার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছো,
তোমার সঙ্গে আমি সব সম্পর্কচ্ছেদ করবো
অস্বীকার করবো তোমাকে– অগ্রাহ্য করবো তোমাকে,
আর যেহেতু তোমাকে আমি যে-জীবন দিয়েছি
তাও পরিশোধ হয়নি

তোমার ওপর যে-ভালোবাসা ঢেলে দিয়েছি আমি
তারও আসেনি কোনো সন্তান।
আমি তোমাকে ছুঁড়ে ফেলে দেবো কোনো সৌর আস্তাকুঁড়ে
যেখানে হাওয়া এসে উড়িয়ে নেবে তোমাকে
বৃষ্টিতে ভিজবে তুমি, কঠিন শীত মুছে দেবে তোমার অর্থকে,
দুপুরের তাপ, নৈশ হিম আন্দোলিত
মহাকাশ-যান মথিত মৃত্তিকা আর ভোরের নক্ষত্র
জ্বলবে তোমার সমাধির ওপর
আমার কবিতা, কি আর বলবো তোমাকে
নতমস্তকে আমি তখন হেঁটে যাবো
একাকী কিছুক্ষণ, উদভ্রান্ত এবং শোকার্ত...

০৬.০৭.২০০৯

০৩.

র বি উ ল হু সা ই ন

....

চারটি চৌপদী পদ্য

এক.

এখনও সময় আছে খুব ভালো হয়ে যাওয়ার
অনেক বেভুলো পথিক বোঝেনি কোনটি সঠিক পথ
ঘাতে ঘাতে প্রতিঘাতে এতদিনে জানতে পেরেছে
মাটি ও মানুষ ছাড়া কিছু নেই আরাধ্য তার

দুই.

ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে নাকি ছড়িয়ে আছে অনেক প্রতিরূপের
প্রকৃতি আমজনতার অনুরূপতা এমনকি সে তুমি আমারও
তাই যদি হয় তাহলে একদিন মিলিত হবে তারা ঠিকই
হয়তো আজ নয় কাল নয় কোন একদিন তখন কী হবে স্বরূপের

তিন.

প্রকৃতি তো সবকিছু নিয়েই গঠিত গাছপালা মানুষজন এহেন
কারণে সে স্থির দৃঢ় তার অভিভাবকত্বের দায়িত্ব পালনে
আর তাতে প্রমাণিত হয় আমরা প্রকৃতিরই অংশবিশেষ
তাই যদি হয় তাহলে মানুষ প্রকৃতি-ধ্বংসে এত মেতে ওঠে কেন

চার.

ত্যাগেই আনন্দ যত, তাই দেখি কিছু কিছু হাজী মহসিন
মাঝে মাঝে উঁকি দেয় এই জগতের জীর্ণ গবাক্ষ ধরে
মূত্রত্যাগ মলত্যাগ বীর্যত্যাগ বা যে কোন স্বার্থত্যাগ যদি
চরম আনন্দের হয় তাহলে প্রাণত্যাগও হবে নিশ্চয় শীর্ষানন্দে লীন

০৪.

মো হা ম্ম দ র ফি ক

....

আমার মা

আমার মায়ের মতো মা নেই, না থাক,
মাকে খুঁজতে হয় বালুপাথরের মমি খুঁড়ে খুঁড়ে;
জল তো বহতা নয়, বয়ে চলে মড়া-সাধকের
পর্ব-পর্বান্তরে আত্মবলিদান;

এমন মায়ের দেশে, পায়ে-পায়ে মাতৃহন্তারক;
শিরা-ধমনির খাঁজ ছুঁয়ে নিয়তই মাথা তুলছে
বিষকাঁটারির ঝোপ, ফণি-মনসার তিতিক্ষায়
রাঙানো ঝলসানো এক-একটি পদছাপ;

বাসরে লেগেছে অগ্নি, ধোঁয়া ছুটছে মুহুর্মুহু,
আলতা-রাঙা দুপায়ে মায়ের স্বামী-সোহাগের
মৃত ঢোঁড়া, টেনে নিচ্ছে যতদূর, পাতাল-প্রবেশ
দ্বারে লেখা শতাব্দীর দাহ্যমন্ত্র;

লেলিহান শিখা ধেয়ে ঝরে পড়ছে অবিরাম,
রক্তে আঁকা বিধুমুখ আমার মায়ের!

০৫.

কামাল চৌধুরী

....

এই দেশ তাঁতিপাড়া থেকে দূরে নয়

অনেক নদী পার হয়ে যে দেশে আসি, সে দেশ চিনি না
কমলালেবুর মতো চাপা, রসালো গোলকে এই দেশ ছিল, আজো আছে
গোলার্ধ ভুল হলে কম্পাস আছে, চুম্বকে আস্থা রেখেছি
অথচ চশমার কাঁচে যা পড়ছে ধুলো নয়, বৃষ্টিও নয়, উত্তর বা দক্ষিণও নয়

যে সব গাছের দেখা তারা কেউ জন্মায় না মাটিতে
কোথায় যে জন্মায়? শেকড়ের ধারণা নিয়ে এই প্রশ্নে ক্লান্ত পথশ্রম
অথচ বৃক্ষসব এখনও সবুজ, শুধু শাখা প্রতিরাতে নিজেরই হারানো ডালে
ঘুরে ঘুরে ন্যাড়া হয়ে যায়
একটাই পরিচিত ঋতু, শীত
অথচ এই দেশে চাদরের বিকিকিনি নাই!

এই একটা ভালো দিক, আমারও তো শীত লাগছে না
এক বস্ত্র ময়লা হলে অন্য বস্ত্র প্রয়োজন নেই
উদোম শরীর মানে শিল্পের ভাষা – এই পর্যবেক্ষণের ফাঁকে
মসলিনের দু'একটি কাটা আঙুল নড়ে উঠতে দেখে ধারণা করেছি

এই দেশ তাঁতিপাড়া থেকে দূরে নয়

০৬.

জা হা ঙ্গী র ফি রো জ

....

মহাশূন্যের ডালে ডালে ফুল

স্বচ্ছজল গভীরতা পেলে নীল
শূন্যতাও নীল হয়ে ধরা দেয় ।
ওই শূন্যতার বুকে আকাশ ঘুমিয়ে আছে
শূন্যতার স্তর নিয়ে জ্ঞানও নিশ্চুপ
তবে ধর্মগ্রন্থ সাতটি আকাশের কথা বলে ।
এক-একটি আকাশ কতটা দীর্ঘ?
ঘড়ির কাঁটার গতি পথভুলে
রয়েছে নিশ্চুপ ।

আকাশের শরীরেই মহাকাশ শিকড় বিছিয়ে বেড়ে ওঠে
মহাকাশ মহাশূন্যেই ডালপালা মেলে
তার ডালে ডালে ফুল
মহাশূন্যের পাতা অপূর্ব সুন্দর কালো ।
আমাদের চেনা গাছ গভীর সবুজ হলে
যতটা সুন্দর
সেই মতো মহাশূন্যের পাতাগুলো ।
দেখ কী সুন্দর মহাশূন্যের ফুল
অন্ধকার পাতার আড়ালে ফুটে আছে ।
ওদিকে তাকাও
দেখ কী গভীর কালো দুটি চোখ
ভুরুপল্লবের নিচে
মহাশূন্যের ইশারায় কথা বলে ।
এমন ঘনিষ্ঠ রাতে অসংখ্য তারার ফুল
পৃথিবী নামের মেয়েটির চোখে ছায়া মেলে
ওই চোখে মহাশূন্যের গভীরতা দেখেছি নিশ্চুপে ।

০৭.

ম ঈ ন চৌ ধু রী

....

আহা শূন্য, মহাশূন্য!

হঠাৎ করে ভুলে গেলে সব ভোলা যায়?
হয়তো বা যায়, মন পুড়ে যায় যন্ত্রণায়।

কী যে এক অসম্ভব সম্ভব করে বর্তমানে থেকে
ঐ ইতিহাস, ভালবাসার পুতুল, স্বপ্ন ভুলে গিয়ে,
সময় জড়িয়ে কিছুটা ফসিল অথবা পাথর
হয়ে গেছি আকস্মিক অবিবেচক বস্তুকণা গিলে।
শেষ কই এখনো জানি না, এটুকু জানি আজো
নিজস্ব অবাস্তবে এতদিন ছিল ঈস্পাত গোলক,
নিজেকে ঈশ্বর ভেবে স্বপ্নের কক্ষ পথে হঠাৎ যখন
সৃষ্টির গ্রহ-সম্পদ রাখি,– শূন্য হয়ে যায়।

সব ভুলে গেলে শূন্যতা কবিতার মতো হয়
যন্ত্রণার অর্থ বিলোপে বিপরীত চলে আসে,
আহা শূন্য মহাশূন্য শূন্য শূন্য ভেবে
সমাধান সব চলে আসে ঘরে গণিতের মতো।

পুড়ে যাওয়া বাস্তবিকের ছাইগুলো সব
উড়িয়ে দিলেই পাই কবিতা,– করি অনুভব।

০৮.

খো ন্দ কা র আ শ রা ফ হো সে ন

....

শেয়াল

টেড হিউজ দেখেছিলেন মধ্যরাতের শেয়াল
শাদা বরফ ঢাকা প্রান্তরের উপর দিয়ে
এগিয়ে আসছে: অন্ধকারে তার শরীর
দেখা যায় না, শুধু গাড়ির হেডলাইটের মতো
দুটো চোখের আলো এগিয়ে আসছে, আসছে,
একাগ্র, একনিষ্ঠ, অনুতাপহীন ।
বরফের ওপর তার পায়ের ছাপ –
একসময় কবির সামনে বিছানো বরফশাদা পৃষ্ঠা
ভরে উঠল শৃগালস্য পদছাপে –
লেখা হলো কবিতার সান্দ্র অক্ষরমালা ।

এখন মধ্যরাত । আমার জানালার পাশেও
বিরাজমান মহামহিম অন্ধকার;
আকাশে তারারা ফুটেছে, যেনো ঝাঁপির ভেতর
কেউ ভরে নিয়েছে হাজারখানেক জোনাকপোকা,
তারপর হেঁটে হেঁটে ঘরে ফিরছে, ঘরে ফিরছে ।
আমিও অপেক্ষায় রয়েছি সেই শেয়ালের –
তিনি এসে নাক ঘষবেন জানালার শার্সিতে,
তাঁর পদছাপে ভরে উঠবে নিষ্কলঙ্ক কাগজের বুক ।
কিন্তু না তিনি আসছেন না, দূরে কোথাও নেই

হেডলাইটের আলো : সন্দিগ্ধ চোরের মতো
কিংবা বীরের উচ্ছাস নিয়ে আজ রাতে
কেউ আসবে না আর । রবীন্দ্রনাথের প্রিয়া,
দূর উজ্জয়িনীনগরের আলো হাতে ঊর্বশী রূপসী নয়,
নয় কালো নরকের পথে-পথে, স্বর্গের অ্যাভিন্যু ধ'রে

আগে-আগে হেঁটে-যাওয়া বিয়াত্রিচে –
আজ এই নক্ষত্রের ঝুমঝুমি বাজানো মধ্যরাতে
এক রুক্ষ নাসামর শৃগালের
পদশব্দ শোনার অপেক্ষায় আছি ।

০৯.

জু য়ে ল মা জ হা র

....

প্রেতের প্রার্থনা

নদীটাকে ঠিক বানিয়ে ফেলবো খাল
আর খালটাকে মোক্ষম ফুৎকারে
হাওয়া করে দেবো । হাওয়া যেন কোনোদিন
ঢুকতে না-পারে শহরের ফুসফুসে ।
আমি চাই যেন বসন্ত ও বর্ষার
গান থেমে যায়, না-ওড়ে ধাতুর পাল
দূর আমাজনে, ধু-ধু এই আঙিনায়
খাড়া শিখণ্ডী রয়েছে পতাকা তুলে ।
উদ্বাহু এক মৃত্যুমলিন ছায়া
মরীচিকা ছুঁড়ে পেছনে নিজের আর
অনেক ছায়ার বাঁকা-থেৎলানো লেজের
প্রতিভাস দেখে যেন-বা আঁতকে ওঠে ।
খাড়া শিখণ্ডী থাকুক পতাকা তুলে ।

৩০ জুন ২০০৯, মালিবাগ, ঢাকা ।

১০.

মা সু দু ল হ ক

....

সমুদ্রের স্বপ্ন

আমাদের ছোটখাটো হিংসার সরু খালে
ঝিনুক, শামুক, পুঁটি
আর চিংড়ি-চালের
কতো ক্ষোভ আছে মিশে!

শিং, কই, মাগুরের কাঁটা
স্নায়ুহীন মস্তিষ্কে বসিয়ে কেউ কেউ
কাদায় লাফায় অন্তঃস্রোতের মানসাঙ্কে

আর কেউ রাঘব বোয়ালের হা-নিয়ে
গিলে খেতে চায় ভাবনার সময়
কেউ কেউ উড়ুক্কু মাছের মতো
লাফিয়ে ফের আসে এইখানে
আমাদের এই ছোটোখাটো হিংসার সরু খালে

নোনাজল নেই এইখানে
মিষ্টি জলের অর্বাচীন এই আমরা
জলজের মুখোশে– হিংসার সরু খালে
সমুদ্রের স্বপ্ন নিয়ে আছি বেঁচে ।

তাতে কিছু যায় আসে না ।

১১.

চ ঞ্চ ল আ শ রা ফ

....

ওঠা

তেল মারতে মারতে লোকটা উপরে উঠে গেল । এখন তার পা ঝুলে থাকে মাথার উপরে । তাকে তেল মারা এখন আমাদের কর্তব্য । খুব প্রতিযোগিতার মধ্যে আছি । গ্যালন আসছে, ড্রামও হাজির । কেউ-কেউ গোপনে ঘি, বাটার অয়েল, অলিভের তেল তার পা হাতের নাগালে পেলেই করছে মালিশ । কারও নালিশ নাই– তেল মারা যদি ব্যর্থ হয়ে যায়!

লোকটা সুখেই আছে তৈলাক্ত বাঁশের ডগায়...

বেড়েছে তেলের দাম, তবু এত তেল আমরা কোত্থেকে পাই? এদেশে গ্যাসও ফুরিয়ে আসছে, ভূগর্ভ ফাঁকা; সমস্যা নাই– যত তেল উচ্চপদ পায়, সব চুঁয়ে চুঁয়ে-চুঁয়ে-চুঁয়ে পড়বে নিচুদের মাথার উপরে, তারপর শরীর বেয়ে মাটির তলায় চলে যাবে । কী সুখের কথা! এ-বঙ্গ তেলের খনি, যদিও কাটে না শনি; তৈলচক্রে ধরা খেয়ে আমাদের নারী উন্মুক্ত করেছে যোনি, প্রতি সন্ধ্যাবেলা সমস্ত দপ্তর থেকে বেরোয় মিছিল– 'তেল মন্ত্রণালয় চাই'...

লোকটা হাসতে থাকে । বলে, 'আরে উজবুক, তেল নিয়ে তোরা যা করিস, সবটা কি পাই আমি? আমার উপরে আরো পদ আছে, তোদের সমস্ত তেল জিহ্বায় জমিয়ে লেহন করি ওই পা দু'খানা'...

শরীর চকচকে আর পিচ্ছিল হয়ে আছে তার, সূর্যে ও জোছনায় সে ভীষণ উজ্জ্বল
একদিন হঠাৎ ধপাস;
আমরা অসাড়– ঘুমে, স্বপ্নের ভেতর; যখন লোকটির উপরে ওঠার কৌশলগুলি দেখে দীর্ঘশ্বাস আর ঘৃণায় ভরে যাচ্ছে আমাদের বুক

২৯. ০৫. ০৯

১২.

মু জি ব মে হ দী

....

পুরুষের ধর্ম

নারীমানুষের ধর্ম আছে, নারীশরীরের নেই
সম্প্রদায় নিরপেক্ষ খুব নারীর শরীর, জাতপাতহীন

জাতপাতে অন্ধ ধর্মঅলারাও ধর্ম খোঁজে না বিশেষ শরীর পূজায়
পুরুষের ধর্ম বড়ো বিচিত্র জিনিস

১৩.

শো য়া ই ব জি ব রা ন

....

প্রকৃতি

কেন যে যাচ্ছি না তোমাকে ছেড়ে, অস্থিরতা
এই রক্তাক্ত দিনে, দিন বদলের দিন ।
আমাদের মেঠো পথগুলো কালো পিচে ভরে গেল
গ্রামগুলো ভরে উঠলো ইট ও কংক্রিটের ফোঁড়ায়
শব্দ আর তীব্র আলোর বিষে বিষে সারারাত
ঘুম এলো না । তবু তোমাকে ছেড়ে
কেন যে যাচ্ছি না ।
বদলে যাচ্ছে স্নেহময়ী মুখ, গাছের সজীব বাকল
লোল চর্মে ভরে যাচ্ছে সারি সারি বন
দিঘিগুলো হয়ে উঠেছে ডোবা, নদী শীর্ণ খাল
তবুও কেন যে বসে আছি সর্বনাশা চক্ষু নিয়ে
কেউ জানে না ।

১৪.

ম জি দ মা হ মু দ

....

আপেল কাহিনী

সৃষ্টির শুরুতে তুমি একটি অখ আপেলের মতো ছিলে
চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল তোমার রক্তিমগ রে আভা
অরণ্যের মধ্য দিয়ে হাজারো গিরিপথ অতিক্রম করে
তুমি সমুদ্রের দিকে নামতে থাকলে
তোমার এই একাকী যাত্রা বড় কঠিন ছিল
তুমি কোন দিকে যাবে
বামে গেলে ডান, ডানে গেলে বাম
বড় অরক্ষিত হয়ে পড়ে
তোমার যাত্রা সমুদ্র অরণ্য মরুভূমি ও পর্বতের দিকে
তোমার ইচ্ছে হলো বাম গালকে দেখার
তোমরা পরস্পর কথা বলতে থাকলে
ঈশ্বর একটি ধারালো ছুরি দিয়ে
তোমার শরীরকে সমান দু'ভাগ করে দিল; আর

সঙ্গে সঙ্গে তোমরা হয়ে উঠলে এক ও অদ্বিতীয়
এবং কেউ কাউকে তোয়াক্কা না করে দুই বিপরীত
মেরুর দিকে ছুটতে থাকলে
সেই থেকে তোমার শরীর হতে গড়িয়ে পড়ছে
লাল রক্তের ধারা
অসম্ভব যন্ত্রণায় তোমরা দূর থেকে পরস্পরকে দেখতে থাকলে
অথচ তোমার শরীরের সঙ্গে এত সুখ ও সৌন্দর্য ছিল
তুমি জানতে পারো নি

কেননা তোমার পিঠ ছিল পিঠের সঙ্গে
তোমাদের একদিকে ছিল সমুদ্র ও পর্বতের ঝর্নাধারা
অন্যদিকে আকাশ ও মরুভূমি

এতদিন বৃথাই তোমরা ছুটছিলে
কিন্তু নিজেদের শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হবার পর
যখন তোমরা জানলে
মরুভূমি ও সমুদ্রের মিলনের আকাঙ্ক্ষা তীব্রতর হয়ে উঠলো
এবং তোমাদের দুঃখিত করে তুলল...

সেই থেকে বন্ধুর গিরিপথ দিয়ে অমসৃণ শরীরে
গড়াতে গড়াতে প্রায়শ তোমরা ক্ষতাক্ত হয়ে উঠছ
আর কাটা হৃৎপিণ্ডের রক্তের ধারা
সমুদ্রের গর্জন সিংহের আর্তনাদ উপেক্ষা করে
পূর্ণতোয়ার সঙ্গমবিন্দুর দিকে ধাবিত হচ্ছ
কিন্তু তোমরা পুনরায় একত্রিত হবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছ
এই অক্ষমতাই তোমাদের মিলন ও ভালোবাসার গান হয়ে
অরণ্য পর্বত আর সমুদ্র অতিক্রম করে অন্ধকারের
কালোবিন্দুর দিকে ধাবিত হচ্ছে...

১৫.

কু মা র চ ক্র ব র্তী

....

আমি কোথাও নেই

প্রতিটি মুহূর্তের মাঝে আমি আছি কালপুরুষ
এমনকী জন্মমৃত্যুর দুটি দাড়ির মাঝেও একাকী মেরুজ্যোতি, যখন ভাবনার পরিপন্থী হয়ে
হেঁটে যাই বেশ্যাপাড়ার নিস্তব্ধ কোলাহলের অবকাশে , তখনও...

ফুটিফাটা রৌদ্রের ভেতর , ছায়াবিছানো কোনো বৃক্ষের ভেতর,
প্রতারণার কোনো অন্ধকার মৌচাকের ভেতর অথবা ধরো অরণ্যের বৈঠকখানায়
জড়ো হওয়া যাবতীয় স্টিললাইফ রহস্যের ভেতর

জমানো জীবনগুলোকে যখন পেরিয়ে যাই তখন প্রশ্ন আসে
ফুল না শেকড় কে অধিক গুরুত্বপূর্ণ !

ভাবিনি দৃষ্টিহীন বস্তুর অবস্থান ও গুরুত্ব, যা কিছু
পূর্বনির্ধারিত তার প্রায়ান্ধকার থেকে অভিযানে বের হয়ে আসা
আত্মচেতনাগুলো আমাকে ক্লান্ত করে, কেননা
জীবনের পাশ দিয়ে যারা হেঁটে যায় তাদের পদচিহ্ন
ভারী হয়ে সেঁটে আছে এখন প্রশ্নতোলা মনের অন্তরালে ।

বেঁকে যাওয়া দুপুর আর ছায়াবৃত্তগুলো অধিক গোল হয়ে ওঠে
আর দেহের ভেতর বন্দি ছায়াশরীর ক্রমাগত নিশ্বাস ছাড়ে,
নিগূঢ় ছদ্মবেশে বরফমাছের মতো
এখন ভালোলাগে না মরশুমি পাখিদের রংবাজি ।

আমি হবো না কবি কেননা চিলেকোঠায় থাকতে পারিনি আমি,
ছন্দের ভেতর গাঁথতে পারিনি শব্দ ভাঙার গান ।

দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে এখন পা থেকে শিকড় ছড়াচ্ছে, হে ভূমি
শুয়ে থাকতে থাকতে এখন পিঠ থেকে পিরামিড গজাচ্ছে, হে পাথর
রক্তের ভেতর জন্ম নিচেছ হলুদ শৈবাল, হে সমুদ্র

তোমরা বলো তোমরা জান না
কিন্তু আমি জানি আমি আছি , কেননা
আমি যে কোথাও নেই !

১৬.

আ ল ম গী র নি ষা দ

....

ঝুঁকি

আমি সমুদ্রের কাছে যাইনি কখনো

কিনার ঘেঁষে দাঁড়ালে হু-হু বাতাসে কেমন লাগে
কিংবা পাহাড়ের কাছে গেলে!

আমি কি এখন চলে যেতে পারি
সকল সনদপত্র তুচ্ছ করে! ...

১৭.

ই ম রা ন মা ঝি

....

দুধ

অনেক কিছুর মতো মানুষের দুধের স্বাদও আমি ভুলে গেছি কবে। মায়েদের কোলগুলো দেখলে আবার শিশু হওয়ার বাসনা জাগে। শিশু যে ছিলাম তা বিশ্বাসই হয় না এখন।

দুধ ছাড়ান দেওয়ার সময় মায়েরা বোঁটায় আকাশি লতার তিতা রস দেয় কিংবা হলুদ মরিচ। জানি নারী শিশুর চেয়ে পুরুষ শিশুরাই ঐ সময় বেশি কাঁদে। পুরুষ শিশুদের দুধ খাওয়ালে বহু মায়েরই গলা শুকিয়ে রোজা ভেঙে যেত। ...

১৮.

ফেরদৌস মাহমুদ

....

ঝড়ের রাতের গান

ঝড়ের রাতে, বহু গাছকে লড়াই করতে দেখেছি
ঝড়ের রাতে, বহু পাখিকে বিদ্যুৎ ঠোঁটে নিয়ে
বাতাসের ডালে বাসা বুনতে দেখেছি

ঝড়ের রাতে, বহু পিঁপড়েকে শাদা দেয়ালে
কুচকাওয়াজ করতে দেখেছি

ঝড়ের রাতে, বহু বাড়িওয়ালাকে ধোঁয়া ওড়াতে ওড়াতে
খুকখুক কাশতে দেখেছি

ঝড়ের রাতে, বহু ভাবুকেরে ফ্রয়েড কিংবা মেঘদূত হাতে
নৌকার দুলুনির কথা ভাবতে দেখেছি

ঝড়ের রাতে, দেখিনি কোনো লঞ্চযাত্রিকে জলপাইয়ের আচার খেতে
কিংবা নিশ্চিন্তে ডুবে যেতে ঘুমপাহাড়ের গানে ।

১৯.

[ক বি অ জ্ঞা ত]

....

আমাদের ইশকুল বাড়ি

ঘাসসরণির কাছে সহাস্য পুজোর দিন, শাদা ব্রিজ পার হলে আমাদের
ঘনশ্যাম ইশকুল লবাড়ি, বেতহাতে মাস্টারমশাই, বাতাসে লতিয়ে ওঠা
খয়েরি রুমাল, অটোগ্রাফের নতুন খাতা লোকচক্ষুর আড়ালে অশ্রুমুখী,
ঝোপের শরীর ঘেঁষে বুক খোলা দুপুরের চলাচল, দোয়েল শিস,
তারপর হঠাৎ একটা লাল নতুন আপেলরাঙা পরীদের মতো ঘুরে ঘুরে
নিস্তব্ধ পুকুরে নেমে গেলে কুয়াশায় ভরে গেল চরাচর,
আর এই প্রগাঢ় কুয়াশার মধ্যে এইখানে মাঝেমধ্যে নেমে আসে নক্ষত্র বেড়াল
একটু মাছের লোভে, শ্যাম্পু-করা হাইব্রিড ভালোবাসা বিকেলে বাগানে গিয়ে
গল্প করে, পাশেই অশ্বত্থগাছ:
তার ডালে বসে থাকা অনির্ণেয় ভুতুড়ে প্যাঁচার ডাকে কেঁপে কেঁপে ওঠে

শান্ত পুকুরের জল, পুকুরের জলে বুঝি লেগেছিল ভূতের আছর,
নইলে সেদিন কারা জোছনায় ছুঁড়েছিল ঢিল?
ঠিক তিন দিন পরে নীল শাড়ি রহস্যজনকভাবে ভেসে গেল পুকুরের জলে,
তারপর বিকেলে উঠল ঝড়, সেই থেকে আমাদের গল্প শুরু।
তারপর ঝরাপাতা উড়ে এলো
তারপর বিকেলের দীর্ঘশ্বাস
তারপর রুপালি আগুন...
তারপর সারারাত জোছনায় ঘোড়ার পায়ের শব্দ!
অবশ্য অশ্বত্থগাছ জানে:
মানুষের মুখ মানে ভাবনার আঁকিবুঁকি, জলের ভেতরে বাঁকা স্রোত,
কিংবা ভাঙা আয়নায় প্রতিফলিত কুয়াশা।
সাংস্কৃতিক বিপ্লবের দিনে রেডবুক হাতে নিয়ে মারা হলো অসংখ্য চড়ুই–
কুয়োয় বালতি নামে– খোকা, তুই ফিরে আয়– প্রবল বৃষ্টির মধ্যে মনে পড়ে...
সূর্যাস্তের লালচে মেঘের নিচে ভাসমান পাখিদের সভাগৃহ থেকে
ফেরার একটু পরে আমাদের ছাদের ওপর
আন্দ্রেই তারকোভস্কির সংগে দেখা হলো।

ওখানে গাছের ডালে ঝুলে থাকা বাবুই পাখির বাসা নক্ষত্ররাত্রির গল্প
আমাকে বলেছে: একদিন অনুতপ্ত হেলমেট
বিপদসীমার ঊর্ধ্বে উঠে এসে
রাইজোম্যাটিক প্রকৃতিময়তার কাছে শুনেছিল
দীর্ঘ ও রহস্যময় এক তীর্থযাত্রার গল্প– অনন্তের গান;
কাঁটাচামচের রাত্রি অসংখ্য মুখোশ নিয়ে ফিরে এলো– তারপর সতত ভাসান...

[বি. দ্র. কবিতাটি ডাকযোগে এসেছে, সঙ্গে কবির নাম ছিল না। কবিকে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা গেল।]

প্র কা শি ত ক বি তা র আ লো চ না

....

বি শ্ব জি ৎ ঘো ষ

[এ সংখ্যায় প্রকাশিত কবিতাগুলোর কবির নাম মুছে দিয়ে এগুলোর ওপর একটি আলোচনা লিখে দেয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলাম মান্যবর বিশ্বজিৎ ঘোষকে। সীমাহীন ব্যস্ততার মধ্যেও প্রতিটি কবিতা ধরে তিনি আলোচনা সমাপ্ত করেছেন। কবিতার সঙ্গে কবির নাম না-থাকায় তিনি কবিতার নাম উল্লেখ করে আলোচনাটি সম্পন্ন করেছেন। এতে আলোচনাটি কবি-ব্যক্তির প্রভাবমুক্ত থেকেছে আশা করা যায়।]

১.
‘বেলা শেষের খেলা’ কবিতায় কবির প্রেমচেতনা, মৃত্যুভাবনা এবং অধ্যাত্মবোধ অভিন্ন সত্তায় এক মোহনায় মিলিত হয়েছে। জীবনের অন্তিম লগ্নে স্রষ্টাকে কবি প্রেমের প্রতীকে কল্পনা করেছেন; আবার প্রেমকে খুঁজেছেন স্রষ্টার পরম সত্তায়। মৃত্যুর সন্ধিলগ্নে দাঁড়িয়েও কবি প্রেম কিংবা বলি স্রষ্টার সান্নিধ্যলাভের আকাঙ্ক্ষায় উন্মুখ। অসামান্য গীতধ্বনিময় এ কবিতায় কবির পরিণত জীবনবোধের স্ফটিকসংহত প্রকাশ ঘটেছে।

২.

'আমার এতকালের অপাঙ্ক্তেয় কবিতাগুলির প্রতি' কবিতায় কবি যেন নিজের সত্তার সঙ্গে কথা বলতে বসেছেন। দীর্ঘদিন ধরে কবিতা লিখছেন কবি– বাসনা ছিল অমরতার। কিন্তু আজ মনে হচ্ছে কবিতা সে-অমরতা দিতে ব্যর্থ, কবি যা চেয়েছিলেন কবিতার কাছে, তা অধরাই থেকে যাচ্ছে। শিল্পের এই খেলা, স্রষ্টার বা কবির শাশ্বত এই অতৃপ্তিই এই কবিতার মূল উপজীব্য। কবিতা কবিকে প্রত্যাশিত কিছু দিতে পারেনি, তার অর্থ কবির অতৃপ্তিই বড় হয়ে যাচ্ছে। স্রষ্টার চিরায়ত এই অতৃপ্তিই আলোচ্য কবিতায় উঠে এসেছে নিপুণ শব্দবন্ধে।

৩.

চারটি চৌপদীতে কবির চার ধরনের অভিজ্ঞতার রূপায়ণ ঘটেছে। প্রথম চৌপদীতে মাটি ও মানুষের প্রতি কবির গভীর অনুরাগ শিল্পিতা পেয়েছে। ঘাত-প্রতিঘাতে গন্তব্যের দিকে এগিয়ে যায় জীবন– এই উপলব্ধিই প্রথম চৌপদীর মূল কথা। দ্বিতীয় চৌপদীতে আছে নির্বেদ ও নিঃসঙ্গতাপীড়িত মানুষের অভ্যন্তরে সংলগ্নতার যে চিরায়ত সূত্র আছে, সে-বিষয়ে কবির গভীর বিশ্বাসের কথা। তৃতীয় চৌপদীটি একটি অনিবার্য প্রশ্ন দাঁড় করিয়ে দিয়েছে আধুনিক মানুষের সামনে; মানুষ ও প্রকৃতি যদি অভিন্ন হয়, তাহলে মানুষ কেন প্রকৃতিকে ধ্বংস করতে এত উদ্যমী? এ প্রশ্নের কি কোনো উত্তর জানা আছে আধুনিক মানুষের? শেষ চৌপদীটি কবির জীবনাভিজ্ঞতার স্পর্শে অসামান্য। যে মানুষ ত্যাগ করতে জানে, অর্জনের অধিকার কিংবা আনন্দ কেবল তার– এই শাশ্বত দর্শনের প্রকাশ ঘটেছে শেষ চৌপদীতে।

৪.

'আমার মা' কবিতায় কবির মাতৃবন্দনা ও দেশপ্রেম সমার্থক হয়ে গেছে। এখানে কবির মা-ই কবির স্বদেশ। মা স্বদেশের সমার্থক হলেও, কেউ কেউ মা-কে হত্যা করতে উদ্যত, কেউ বা স্বদেশকে। এই প্রবণতার বিরুদ্ধে কবির অবস্থানই আলোচ্য কবিতাটিকে বিশিষ্ট করে তুলেছে।

৫.

'এই দেশ তাঁতিপাড়া থেকে দূরে নয়' কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে ঐতিহ্যের প্রতি কবির গভীর অনুরাগ। ধসপীড়িত সমকালকে অতিক্রম করে কবি পৌঁছতে চান আলোকিত ভবিষ্যতে। সেক্ষেত্রে তাঁর কাছে বড় শক্তি-উৎস এ দেশের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যসম্পদ। নিজের শেকড়ের সঙ্গে সংলগ্নতার বাসনা দিয়ে কবি এখানে ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধেও তাঁর অবস্থানের কথা প্রকাশ করেন। কেননা, আমাদের নানা ঐতিহ্যিক

শিল্পকে ধ্বংস করেছে ওই ঔপনিবেশিক শক্তি। এই কবিতা উত্তর-ঔপনিবেশিক দ্রোহীচেতনার এক নিগূঢ় প্রকাশ।

৬.

'মহাশূন্যের ডালে ডালে ফুল' কবিতায় কবির মহাজাগতিক বোধের প্রকাশ ঘটেছে। মহাজাগতিক শূন্যতায় কবি দেখেছেন অপরূপ সৌন্দর্যের লীলা। মহাশূন্য কবির কাছে পুরুষসত্তার প্রতিভাত, আর পৃথিবী নারী। পৃথিবী তথা নারীর প্রতি মহাশূন্য তথা পুরুষের চিরায়ত অনুরাগের ব্যঞ্জনায় কবিতাটি বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে। কবিতাটিতে অসামান্য একটি সমাসোক্তি অলঙ্কারের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়– 'আকাশের শরীরেই মহাকাশ শিকড় বিছিয়ে বেড়ে ওঠে।'

৭.

আলোচ্য 'আহা শূন্য, মহাশূন্য' কবিতায় শূন্যতা তথা যন্ত্রণাই যে শিল্পসৃষ্টির প্রত্ন-উৎস, সে-কথা শিল্পিতা পেয়েছে। শূন্য ভুবনেই কবি খুঁজে পান কবিতা লেখার প্রেরণা, যন্ত্রণার ছাই মন্থন করেই তিনি লাভ করেন অধরা আনন্দ। দার্শনিক এই প্রত্যয়ই কবিতাটির স্বকীয়তা।

৮.

'শেয়াল' কবিতায় কবিতা সৃষ্টির জন্য কবির সাধনা ও অনুপ্রেরণার কথা বলা হয়েছে। চাইলেই তো কবিতা লেখা যায় না, তার জন্য টেড হিউজের শৃগালের অপেক্ষায় থাকতে হয়, অপেক্ষা করতে হয় আলো-হাতে রূপসী কোনো ঊর্বশীর জন্য। একসময় ধরা দেয় কবিতা, কখনো তিনি মুখ ফিরিয়ে নেন কবির দিক থেকে। কবিতা সৃষ্টির এই রহস্য, শৃগালের এই লুকোচুরি খেলা নিয়ে গড়ে উঠেছে 'শেয়াল' কবিতা।

৯.

'প্রেতের প্রার্থনা' কবিতায় কবির নিসর্গচেতনা ও পরিবেশ-ভাবনার ছায়াপাত আছে। প্রকৃতিকে ধ্বংস করার জন্য মানুষের যে প্রাণান্তকর চেষ্টা, তারই বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আছে এই কবিতায়। স্যাটায়ার প্রবণতা কবিতাটির বিশিষ্টতার প্রধান মাত্রা।

১০.

'সমুদ্রের স্বপ্ন' কবিতায় দেখা যায়, মানুষ এবং না-মানুষদের নিয়ে গড়ে উঠেছে মানবসমাজ। এখানে প্রতিনিয়ত চলছে স্বার্থ আর হিংসার খেলা, উন্মাদের নাচন; আবার একই সঙ্গে আছে জীবনকে রঞ্জিত করার কোনো মহিম উৎস। এই ইতি এবং নেতি নিয়েই মানুষের সংসার, আর সে-সংসারে আমাদের অবস্থান।

১১.
বাঙালির সহজাত এক বৈশিষ্ট্যের ব্যঙ্গাত্মক শিল্প ‘ওঠা’ কবিতা। তোষামোদ যে কত ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে এ কবিতা থেকে তার ধারণা পাওয়া যায়। উপরে উঠতে চাইলে ‘তেল’ ছাড়া পথ নেই। কবিতাটি পড়তে পড়তে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ‘তৈল’ প্রবন্ধের কথা মনে পড়ে যায়।

১২.
‘পুরুষের ধর্ম’ কবিতায় কবির জেন্ডার-সচেতনতার অভ্রান্ত প্রকাশ ঘটেছে। পুরুষতান্ত্রিকতা নারীকে মানুষ হিসেবে দেখে না, দেখে মাংসের শরীর হিসেবে। ধর্মঅলারাও এ-প্রবণতার বাইরে নয়। পুরুষের এই নারী-শরীর প্রীতিই এ কবিতায় চমৎকার সংহতিতে উন্মোচিত।

১৩.
কবির স্বকীয় প্রকৃতি-চেতনার প্রকাশ ঘটেছে ‘প্রকৃতি’ কবিতায়। প্রকৃতিকে ধ্বংস করে মানুষের অগ্রযাত্রাকে কবি স্বাভাবিক দৃষ্টিতে বিবেচনা করতে পারেননি। তথাকথিত সভ্যতা-নির্মাণের বেপরোয়া গতি কবিকে আতঙ্কিত করে তুলেছে। এই অবস্থা থেকে তিনি মুক্তি চান; কিন্তু সমাজের সর্বত্র নির্বিকার ঔদাসীন্য ছাড়া তিনি আর কিছুই দেখেন না।

১৪.
সৃষ্টির আদি রহস্যঘেরা এক প্রত্যয় নিয়ে রচিত ‘আপেল কাহীনি’ কবিতা। নিজেকে বিচ্ছিন্ন বা বিভাজিত করার মধ্য দিয়ে মানুষের যে অগ্রযাত্রা সূচিত হয়েছিল, উত্তরকালে সে-বিভাজিত সত্তা আর কখনো একত্রিত হতে পারেনি। মানুষের এই চিরায়ত বিচ্ছেদ, অতলান্ত এই নির্বেদ-নিঃসঙ্গতা নিয়ে গড়ে উঠেছে ‘আপেল কাহিনী’ কবিতা। কবিতার পটভূমিতে ধর্মতাত্ত্বিক একটা অনুষঙ্গ উঁকি দিলেও, মানুষের চিরায়ত নির্বেদ আর নিঃসঙ্গতাই এ কবিতায় কেন্দ্রীয় ভাব।

১৫.
একটি গভীর হতাশা কিংবা সামূহিক বৈনাশিকতায় পীড়িত ও পর্যুদস্ত এক কবি-হৃদয়ের আন্তরিক উচ্চারণ ‘আমি কোথাও নেই’ কবিতা। ‘আমি কোথাও নেই’– এই শব্দগুচ্ছের অন্তরালে থেকে যায় এই কথা– কবি সর্বত্রসঞ্চারী হতে চেয়েছিলেন; কিন্তু তাঁর সেই সফলতা আসেনি– তাই একরাশ ব্যর্থতার গান হয়ে ঝরে পড়ে তার অব্যক্ত কথামালা, তার বেদনারাশি।

১৬.

জাগতিকতা অতিক্রম করে মহাপ্রকৃতির সঙ্গে সংলগ্ন হওয়ার তীব্র আকুতি আছে 'ঝুঁকি' কবিতায়। দৈনন্দিন প্রয়োজন মানুষকে প্রকৃতি থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। তবু কোনো কোনো মানুষ আছেন, যারা যেতে চান প্রকৃতির কাছে এবং এভাবে পেতে চান জীবনের আস্বাদ। ছোট এই কবিতাটি, এর অন্তর্নিহিত ভাবনায় তাৎপর্যপূর্ণ এক সৃষ্টি হিসেবে বিবচেনাযোগ্য।

১৭.

টানা গদ্যের 'দুধ' নামক রচনাটি কবিতা হিসেবে উতরে গেছে কি? কবিকে তো একটা অপূর্বত্বের ব্যঞ্জনা আনতেই হয় তাঁর সৃষ্টিতে। 'দুধ' কবিতায় কোথায় সেই অপূর্বত্বের ব্যঞ্জনা? নস্টালজিয়ার স্পর্শ থাকলেও 'দুধ' শেষ পর্যন্ত সিদ্ধি-অনুত্তীর্ণ এক রচনাই থেকে গেছে।

১৮.

'ঝড়ের রাতের গান' নামক তালিকা-প্রবণ এই কবিতায় কবির প্রকৃতিভাবনার ছায়াপাত আছে, আছে স্বতন্ত্র প্রেক্ষিতে জীবন-উপলব্ধির বাসনাও। অভিজ্ঞতার ব্যাপ্তি এবং নিপুণ কল্পনাচারিতা কবিতাটিকে বিশিষ্টতা দান করেছে।

১৯.

জীবন-অনুভূতি এবং জগৎ-ভাবনার নিপুণ প্রকাশ ঘটেছে 'আমাদের ইশকুল বাড়ি' কবিতায়। এখানে যেমন আছে নস্টালজিক অনুষঙ্গ, তেমনি আছে ভবিষ্যৎ স্বপ্নচারিতা। কবিতাটিতে আছে গল্পের আবহ, আছে কথকের লোক-ভুলানো চারিত্র্য-স্বাদ। কবির প্রগত রাজনীতিচেতনাও কখনো কখনো উঁকি দেয় এই কবিতায়। 'বুক খোলা দুপুরের চলাচল', 'নক্ষত্র বেড়াল', 'বিকেলের দীর্ঘশ্বাস', 'নক্ষত্ররাত্রির গল্প'– এমন শব্দগুচ্ছ কিংবা রূপক-প্রতিরূপক কবিতাটির শিল্প-সফলতার মূলে ক্রিয়াশীল।

প্র ব ন্ধ

রা মে ন্দু ম জু ম দা র

নাটক : এই সময় সেই সময়

আমাদের দলের নাটক 'মুক্তি'র এক প্রদর্শনীর আগে টিকিট কাউন্টারে বসে আছি। এক দর্শক টিকিট কিনতে এসে জানতে চাইলেন, নাটকটি হাসির কিনা। আমি সবিনয়ে তাকে বললাম, না– এক অর্থে কান্নার নাটক। তার যুক্তি সারাদিনের কর্মক্লান্তি ও কঠিন জীবনের পর তারা একটু বিনোদন চান। টিকিট করে সিরিয়াস বিষয়নির্ভর নাটক দেখতে চান না। তবু তিনি টিকিট করে নাটকটা দেখলেন। নাটক শেষে বেরোবার পথে আবার আমার সঙ্গে দেখা। তিনি বললেন, না নাটকটা ভালো লেগেছে। আমার ভালো লাগল এই ভেবে যে, একজন দর্শকের পূর্ব ধারণার বদল হয়েছে। এখন থেকে তিনি হয়তো সিরিয়াস নাটকও দেখবেন। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর আমাদের দেশে যে নবনাট্য চর্চা শুরু হয় তার প্রধান অবলম্বন ছিল সামাজিক প্রহসন। সামাজিক নানা অসঙ্গতি নিয়ে যখন শিল্পসম্মতভাবে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করা হয় তখন দর্শক তা লুফে নেন। তার মনের কথাটা নাটকের মধ্যদিয়ে প্রকাশিত হতে দেখেন। তিনি নিজে হয়তো সাহস করে যে কথাটা বলতে পারেন না, সে কথাটি মঞ্চ থেকে উচ্চারিত হতে দেখে তিনি তৃপ্ত হন। আমাদের মৌলিক নাটক সাফল্যের একটা নিশানা পেল।

মুক্তিযুদ্ধ আমাদের সময়ের সবচেয়ে গৌরবের ঘটনা আবার অপরিসীম ত্যাগ ও বেদনারও বটে। বাংলাদেশের এমন কোনো পরিবার কি খুঁজে পাওয়া যাবে যারা কোনো না কোনোভাবে ১৯৭১ সালে ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি? গোটা দেশের মানুষ একাত্ম হয়ে পরাধীনতা থেকে, পাকিস্তানি বর্বরতা থেকে মুক্ত হতে চেয়েছিল। ব্যতিক্রম ছিল কেবল মুষ্টিমেয় কিছু স্বাধীনতাবিরোধী বিকৃত মানসিকতার মানুষ। স্বাভাবিকভাবে মুক্তিযুদ্ধ আমাদের নাটকে অনিবার্য হয়ে উঠল। প্রথমদিকে মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে মূল্যবোধের অবক্ষয় আর পরবর্তীকালে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পর মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী কর্মকাণ্ড দেশে প্রশাসন থেকে গণমাধ্যমে– সর্বত্র যখন মুক্তিযুদ্ধ-বিরোধীদের আস্ফালন, ইতিহাস থেকে বঙ্গবন্ধু যখন নির্বাসিত, বিকৃত ইতিহাস গড়ার অপচেষ্টায় যখন রাষ্ট্রের সকল যন্ত্র সক্রিয় তখন মঞ্চ থেকে স্বাধীনতার চেতনার কথা, মূল্যবোধের কথা, সত্যিকারের

ইতিহাসের কথা নির্ভয়ে উচ্চারিত হল। স্বাভাবিকভাবে দেশের সাধারণ মানুষ এসব মঞ্চ নাটককে স্বাগত জানাল।

আমাদের সবচেয়ে বড় গর্ব আমাদের নাট্যকর্মীদের রাজনৈতিক সচেতনতা ও সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা। এ দায় তারা স্বেচ্ছায় নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছেন। কারণ তারা বিশ্বাস করেন তাদের সকল সংস্কৃতিচর্চার মূলে রয়েছে মানুষ। মানুষের জন্যই শিল্প। তাই তাদের আকাঙ্ক্ষা একটি শোষণহীন, মানবিক মূল্যবোধে সমৃদ্ধ একটি সমাজ। সে সমাজ গঠনে সহায়ক শক্তি হিসেবে তারা কাজ করতে চান। সকল অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে সর্বশক্তি দিয়ে লড়াই করতে চান। সে লড়াই শিল্পের লড়াই, সমাজে মানবিকতাবোধ আবার জাগিয়ে তোলার লড়াই। অনেক সময় শিল্পের মাধ্যমে অন্যায়-অবিচারের প্রতিবাদ যথেষ্ট মনে হয় না। তখন রাজপথে নামতে হয়। সকলে মিলে একজোট হয়ে আন্দোলন করলে দুঃশাসনের অবসান হয়– বাংলাদেশের ইতিহাস এ সাক্ষ্যই দেয়।

নাট্যকর্মীদের এই জনসম্পৃক্ততা আমাদের নাটককে জনপ্রিয় হতে সাহায্য করেছে। সকল শিল্পের মূলে রয়েছে মানুষ– এ জীবনবোধ আমাদের সংস্কৃতিকর্মীদের মধ্যে কাজ করে। নাটকের মধ্যে তা আরও বেশি। কারণ জনগণের কাছ থেকে দূরে বসে একাকী হয়তো কাব্যচর্চা করা যায়, ছবি আঁকা যায় কিন্তু নাটক করা যায় না। নাটক একদিকে যেমন একটা যৌথ শিল্প, অন্যদিকে জীবন্ত মানুষের সামনে অভিনীত হবার লক্ষ্যে সৃষ্ট শিল্প। বেশিরভাগ নাটকই রচিত হয় সমকালে সমসাময়িক মানুষের সামনে অভিনীত হবার জন্য। সে কারণে আমাদের দেশের বেশিরভাগ মৌলিক নাটক আমাদের সমসাময়িক জীবনের হাসি-কান্না, আকাঙ্ক্ষা-বঞ্চনা, গৌরব-হতাশার কথা বলে। সমাজের অন্ধকার দিকে আমরা আলো ফেলি বার বার এ আশায় যে, দর্শক আবার নতুন করে বিষয়গুলো নিয়ে ভাববেন, প্রতিবিধানের পথ খুঁজে নেবেন। সমস্যার সমাধান দেয়া নাটকের কাজ নয়। সমাধান দর্শক নিজেরাই খুঁজে বের করবেন। আমরা কেবল ইঙ্গিত দিতে পারি মাত্র। দর্শকের কল্পনাশক্তির ওপর আমরা ভরসা করি। সব সময় খেয়াল রাখতে হবে নাটক যেন রাজনৈতিক বক্তৃতা বা সামাজিক নীতিকথা না হয়ে ওঠে। বক্তব্যকে শিল্পসম্মতভাবে উপস্থাপনই কুশলী নাট্যকারের দায়িত্ব। আবার যেসব বিদেশী নাটক আমরা অনুবাদ বা রূপান্তরে অভিনয় করি তার মধ্যেও আমরা আমাদের সমাজের সাথে ঐ সমাজের একটা যোগসূত্র খুঁজে পাই। ষাট ও সত্তরের দশকে বিশ্বব্যাপী জার্মান নাট্যকার ব্রেশটের নাটক ব্যাপকভাবে অভিনীত হয়েছে। কারণ সে সময় ব্রেশটের নাটকের সমস্যা আমাদের চেনা সমাজেরই সমস্যা মনে হয়েছে। আমাদের দেশে ব্রেশট যখন রূপান্তরিত হয়েছে তখন মোটেই অচেনা লাগেনি; বরং নাটকগুলো মনে হয়েছে আমাদেরই কোনো নাট্যকারের মৌলিক রচনা। অবশ্য এর জন্য রূপান্তরকারীদের প্রতিভা প্রশংসার দাবি রাখে। তেমনিভাবে মলিয়েরের বা

শেক্সপিয়র হয়ে ওঠেন আমাদেরই সমসাময়িক নাট্যকার। এ কারণেই এঁরা চিরায়ত শিল্পস্রষ্টা।

আজকাল আমাদের দেশে বেশ কয়েকটি নাটক প্রযোজিত হয়েছে যার কাহিনী চয়ন করা হয়েছে মহাভারত থেকে। নাটকের জন্য মহাভারত যেন অজানা এক স্বর্ণখনি। এত উপাদান এখানে ছড়িয়ে রয়েছে যা থেকে উৎকৃষ্ট নাটক রচনা করা সম্ভব। মহাভারতকে ধর্মগ্রন্থ বলে বিবেচনা করলে তাকে একটা সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে বেঁধে ফেলা হবে। তার মূল্যায়ন করতে হবে চিরায়ত মহাকাব্য হিসাবে। বাংলাদেশের মঞ্চে অভিনীত মাধবী, নিত্যপুরাণ, কর্ণকথা, কালসন্ধ্যার কথা এ মুহূর্তে মনে পড়ছে। পাঁচ হাজার বছর আগেকার ঘটনার আজ কী মূল্য আছে? কিন্তু মাধবী নাটকে আমরা দেখি পুরাকালে নারীরা যেভাবে পুরুষের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হত, তার নিজের কোনো মতামতের অধিকার ছিল না– আজও আমাদের সমাজে নারীর অবস্থানের তেমন পরিবর্তন হয়নি, বিশেষ করে গ্রামীণ সমাজে। সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার পুরুষের। নারী কেবল তা মান্য করবে। সে অসঙ্গতিটাই 'মাধবী' আবার নতুন করে আমদের দেখিয়ে দিয়েছে। মাসুম রেজার একটি অসাধারণ সুন্দর মৌলিক রচনা 'নিত্য পুরাণ'। মহাভারতের একলব্যের কাহিনীকে যুক্তিতর্ক দিয়ে নতুন করে আমাদের সামনে দাঁড় করিয়েছেন নাট্যকার। প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন কাব্যের মহানায়কদের। একটা মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করেছেন ঘটনাটিকে। সেখানেই এসব নাটকের বা ঘটনার সমসাময়িকতা।

এক সময় মনে হত আমাদের মঞ্চে মানবিক সম্পর্ক নিয়ে লেখা নাটক কি হারিয়ে যেতে বসেছে? কেবলই রাজনৈতিক বা সামাজিক বিষয়গুলোই মঞ্চ উঠে আসবে? আমাদের সে আশঙ্কা দূর হয়েছে। মানুষে মানুষে সম্পর্ক, গভীর জীবনবোধের নাটকও মঞ্চে আসছে এবং দর্শকের প্রশংসা অর্জন করছে। যদিও বিদেশী, তবু 'মুক্তি' নাটকে মায়ের একাকীত্ব আমাদের স্পর্শ করে। কারণ আমাদের চারপাশে এমন অনেক পরিবারকে দেখি, যাদের বৃদ্ধা মাকে ছেড়ে সন্তানরা চলে গেছে দূরে নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে। একাকীত্বের অভিশাপ বয়ে বেড়াচ্ছে মা। সন্তানদের মানুষ করাই কি তার জীবনের প্রধান দায়িত্ব? তার কি কিছু পাবার নেই। আরেক অসামান্য নারীর ঐতিহাসিক বঞ্চনার কথা তুলে আনা হয়েছে 'বিনোদিনী' নাটকে। নটী বিনোদনী নাটককে ভালোবেসে অসীম ত্যাগের দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। আমাদের সমাজে নারীরা যেন কেবল ত্যাগেই মহীয়সী, তাদের প্রাপ্য কিছু নেই।

এখানে আরেকটি প্রসঙ্গের অবতারণা করতে চাই। আমাদের দেশে প্রায় দু'শ সক্রিয় নাট্যদল রয়েছে। যারা প্রতিবছর অন্তত একটি নতুন নাটক অভিনয় করতে আগ্রহী। কিন্তু সে তুলনায় আমাদের মঞ্চসফল নাট্যকারের সংখ্যা খুব কম। সত্তরের দশকে যারা আমাদের প্রধান নাট্যকার, আজও তারাই আমাদের নাট্যচর্চাকে পল্লবিত করে চলেছেন। তাদের কাতারে উঠে আসা নতুন নাট্যকার সংখ্যায় খুব নগণ্য। সৈয়দ

শামসুল হক, মমতাজউদ্‌দীন আহমদ, আবদুল্লাহ আল-মামুন, মামুনুর রশীদ বা সেলিম আলদীনদের সাথে যুক্ত হয়েছে এসএম সোলায়মান (অকাল প্রয়াত), মান্নান হীরা, মাসুম রেজাদের মতো অল্প কয়েকটি নাম। তবে আশার কথা এর পরের সারিতে বেশ কয়েকজন সম্ভাবনাময় নাট্যকারকে বেড়ে উঠতে আমরা দেখছি। অনুবাদ ও রূপান্তরে আমাদের নাট্যচর্চাকে সমৃদ্ধ করে চলেছেন কবীর চৌধুরী, আবদুস সেলিম, সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, গোলাম সারোয়ার, বিপ্লব বালা, তারিক আনাম খান প্রমুখ।

আমাদের কৃতী নির্দেশক-অধ্যাপক-গবেষক ড. সৈয়দ জামিল আহমেদ তার সাম্প্রতিক এক নিবন্ধে অভিযোগ করেছেন যে, সাম্প্রতিক নাটক নিয়ে আলোচনার সময় আমরা কেবল শহুরে গ্রুপ থিয়েটার চর্চার কথাই তুলে ধরি। বৃহত্তর জনজীবনে যে লোকনাট্য ছড়িয়ে আছে তাকে বিবেচনায় আনি না। মূল ধারার নাট্যচর্চা কোনটা– গ্রুপ থিয়েটার না লোকনাট্য? সংখ্যা বা ব্যাপ্তির বিচারে কোনটা মূল ধারা? আমরা কি অস্বীকার করতে চাইছি বা মুছে দিতে চাইছি আমাদের সে লোকজ উত্তরাধিকার? জামিল আহমেদের অভিযোগের যুক্তি আমি মাথা পেতে স্বীকার করছি। আমরা আমাদের অভিজ্ঞতার অভাবে লোকনাট্যের কথা উল্লেখ করি না। প্রয়োজনও অনুভব করি না গ্রামীণ জনজীবনে ব্যাপক প্রভাব বিস্তারকারী এসব লোকনাট্য চর্চার। স্বীকার করি আমাদের সুযোগও কম। এমনকি সবচেয়ে বহুল অভিনীত যে যাত্রা তা দেখার সুযোগও ঢাকাবাসীর খুব কম। আর যাত্রার তো পদে পদে বাধা। অথচ যাত্রাই আমাদের পেশাদার নাট্যশিল্প। এ পেশায় থেকে জীবিকা নির্বাহ করেন কয়েক হাজার শিল্পী। কিন্তু সমাজের ঔদাসীন্যে, সরকারি পীড়নের ফলে তারা আজ মানবেতর জীবন যাপন করতে বাধ্য হচ্ছেন। যাত্রার যারা আয়োজন করেন তারা একে উপলক্ষ করে স্থানীয় প্রশাসনের যোগসাজশে বসান মদ-জুয়ার আসর। আর সে দায় বহন করতে হয় যাত্রাশিল্পীদের। অনৈতিক কার্যকলাপের দায়ে বন্ধ থাকে যাত্রাশিল্প। তার সাথে এখন যুক্ত হয়েছে বোমা সংস্কৃতি। ধর্মান্ধ মৌলবাদী শক্তি চায় না আমাদের দেশে কোনো সুস্থ সংস্কৃতিচর্চা হোক। তারা বোমা হামলা করে তা বন্ধ করতে চায়। ব্যস, সে আশঙ্কায় বন্ধ হয়ে যাচ্ছে ঢাকার বাইরে সকল সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড। প্রশাসন অনুমতি দিতে চাইছে না সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের। প্রকারান্তরে বোমাবাজদের উদ্দেশ্যই সফল হতে চলেছে। অথচ সকল নাগরিকের নিরাপত্তা বিধান করার দায়িত্ব সরকারের, সকল সামাজিক-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান যাতে নিরাপদে ও বাধাহীন পরিবেশে হতে পারে তার নিশ্চয়তা বিধান করবে সরকার। অবশ্য সরকারেই যখন মৌলবাদীদের শক্ত অবস্থান, তখন এ আশা আমাদের কাছে দুরাশাই।

আমাদের গ্রুপ থিয়েটার চর্চার একটা প্রবণতা খুবই প্রশংসাযোগ্য, তা হচ্ছে লোকনাট্যের উপাদান বা ফর্মগুলোকে আধুনিক মঞ্চনাটকে ব্যবহার করা। ঢাকা থিয়েটার এ বিষয়ে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছে। আসলে ঐতিহ্যের অন্বেষণ তখনই অর্থবহ হয় যখন ঐতিহ্যকে আমরা পুনরাবিষ্কার করতে পারি, ঐতিহ্যকে

বর্তমানের সঙ্গে মেলাতে পারি। আমাদের নাটক তখনই 'আমাদের নাটক' হয়ে উঠবে যখন পাশ্চাত্যের অনুসরণ নয়, আমাদের লোকঐতিহ্যের উপাদান সুষ্ঠুভাবে আমাদের প্রযোজনায় প্রয়োগ করতে পারব।

আমাদের দেশে আদিবাসীরা যেন নিজ ভূমে পরবাসী। দীর্ঘদিন ধরে তারা নানাভাবে অধিকার বঞ্চিত। তাদের সংগ্রামী ঐতিহ্যও অবহেলিত, অনেকটা যেন অপাঙ্‌ক্তেয়। সেই আদিবাসী সমাজের সংগ্রামকে ভিত্তি করে মামুনুর রশীদ রচনা করেছেন দর্শকনন্দিত নাটক 'রাঢ়াঙ'। বিষয় ও প্রযোজনার ভিন্নতার কারণে নাটকটি আমাদের নাট্যচর্চায় একটি নতুন ধারার সূচনা করেছে। তারই তারই ধারাবাহিকতায় মঞ্চে এসেছে 'মানগুলা'। ফলে আমাদের নাট্যচর্চায় একটা বৈচিত্র্য এসেছে। নিরীক্ষাধর্মী নাটকও মঞ্চস্থ করতে সাহসী হয়ে উঠেছেন আমাদের নাট্যদলগুলো। আশির দশক থেকেই নাটক নিয়ে নানা নিরীক্ষা আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। সম্প্রতি জন্মসূত্র তাদের প্রথম নাটক 'অহরকণ্ডল' মঞ্চে এনে সাহসের পরিচয় দিয়েছেন। সুলিখিত ও সুঅভিনীত নাটকটি দর্শকের জন্যে ছিল একটি ভিন্ন অভিজ্ঞতা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যকলা বিভাগের শিক্ষার্থীদের নাটকগুলোও আমাদের নাট্যচর্চায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারবে। বেহুলার আখ্যানকে সৈয়দ জামিল আহমেদ যেভাবে উপস্থাপন করেছেন, তাতে তার শিল্পভাবনায় আমরা আবারও মুগ্ধ হলাম। বেশ কয়েক বছর তিনি গবেষণা ও লেখালেখিতে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন। ফলে মঞ্চে তার সৃষ্টিশীলতা থেকে আমরা বঞ্চিত হয়েছি।

অনেকেই অভিযোগ করেন সত্তরের দশকে আমাদের নাট্যচর্চায় যে জোয়ার এসেছিল তা এখন অনেকটা থিতিয়ে গেছে। তাহলে কি ভালো প্রযোজনা হচ্ছে না? কথাটা মোটেই ঠিক নয়। বরং সত্তরের দশকের চাইতে এখন অনেক বেশি মানসম্পন্ন মেধাবী প্রযোজনা আমরা দেখতে পাই। আগে নাটকের দল কম ছিল; তাই ভালো নাটকগুলো বেশি অভিনয়ের সুযোগ পেত, দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারত। বহুল আলোচিত হত। এখন দলের সংখ্যা বেড়েছে। অনেক বেনোজল ঢুকে পড়েছে। সবারই গণতান্ত্রিক অধিকার। তাই দলগুলোর নিজ নিজ প্রযোজনা মঞ্চায়নের সুযোগ কমেছে। ভালো প্রযোজনাগুলো তেমনভাবে দর্শকের চোখে পড়ছে না। প্রতিষ্ঠিত দলগুলোর পাশাপাশি নতুন নতুন দলের প্রযোজনায় মেধা ও শ্রমের পরিচয় ফুটে উঠেছে। তবে নাট্যকর্মীদের যে উদ্যম, তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পৃষ্ঠপোষকতা বাড়ছে না। নতুন প্রযোজনার ব্যয় নির্বাহের জন্যে নাট্যদলগুলোকে গলদঘর্ম হতে হয়। স্বেচ্ছাশ্রমের উপর যদি অর্থনৈতিক ভার বহন করতে হয় তাহলে নাটকের বিকাশ কষ্টসাধ্য হয়ে ওঠে। তবু নাটক এগিয়ে চলেছে। আর সরকার বক্তৃতায় নাটকের গুরুত্ব স্বীকার করলেও এক ধরনের ভয় তাদের মধ্যে কাজ করে। ভয় নাটকের শক্তিকে, ভয় তার সমালোচনাকে। তাই সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা বার বার নিরাশ করছে নাট্যকর্মীদের। জাতীয় নাট্যশালার সুযোগ-সুবিধা সহনীয় ভাড়ায় ব্যবহার করতে দেয়া

হচ্ছে না। এ পরিস্থিতিকে বিদেশের সঙ্গে তুলনা করলে নিজেদের বড় দুর্ভাগা মনে হয়।

সব প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও নাটক এগিয়ে চলেছে। কারণ নাটকের ধর্মই হচ্ছে কোনো বাধা না মানা। প্রয়াত আবুল ফজল বলেছিলেন, একুশ মানে মাথা নত না করা। আমরাও বলতে চাই, নাটক মানে বাধা না মানা। জয় হোক বাংলাদেশের নাটকের।

সৈ য় দ আ জি জু ল হক

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্যে জীবন ও শিল্পবোধ

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৯০৮-৫৬) জন্মশতবর্ষে তাঁর জীবনের কতকগুলো বৈশিষ্ট্যকে স্মরণ করা আবশ্যক। একথা হয়তো ঠিক যে, অচেতন-অবচেতনে, স্বপ্ন-কল্পনায় কৈশোরকাল থেকেই তাঁর মধ্যে একটি লেখকসত্তা গড়ে উঠেছিল, কিন্তু এটিই প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, মানিক বন্ধুদের সঙ্গে বাজি ধরে গল্প লিখে তা বিখ্যাত পত্রিকায় ছাপিয়ে আকস্মিকভাবে লেখকজীবনে প্রবেশ করেছিলেন (ডিসেম্বর ১৯২৮)। তারপর সম্পাদকদের তাগিদে তাঁর লেখকজীবনে চলে এসেছিল এমন ব্যস্ততা যে, তাঁর পক্ষে শিক্ষাজীবন সমাপ্ত করা আর সম্ভব হয়নি। শুধু তাই নয়, লেখকজীবনে প্রবেশ করার কিছুদিন পরই তাঁর মধ্যে জন্ম নিয়েছিল রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র-পরবর্তী সাহিত্য ক্ষেত্রে আত্মপ্রতিষ্ঠার এমন আগ্রহ যে, তিনি ব্যাপৃত হয়েছিলেন এক 'প্রাণান্তকর' সাহিত্যসাধনায়। তাঁর লেখকজীবন শুরুর পরবর্তী সাত বছরের (১৯২৯-১৯৩৫) মধ্যে তিনি লিখে ফেলেন বেশ কিছু শ্রেষ্ঠ গল্প ও উপন্যাস। যেমন, *জননী*, *দিবারাত্রির কাব্য*, *পদ্মানদীর মাঝি*, *পুতুলনাচের ইতিকথা*, 'আত্মহত্যার অধিকার', 'প্রাগৈতিহাসিক', 'সরীসৃপ', 'কুষ্ঠরোগীর বৌ', 'সাহিত্যিকের বৌ' প্রভৃতি। ফলে এ-সময়ের মধ্যেই তিনি শিকার হন (১৯৩৫) এপিলেপ্সি নামক এমন এক দুরারোগ্য ব্যাধির, আমৃত্যু যা তাঁর সঙ্গী থাকে। রোগের তীব্রতা থেকে রক্ষাকল্পে এমন স্ব-উদ্ভাবিত ওষুধের ব্যবস্থা তিনি করেন, যা তাঁকে ক্রমশ অ্যালকোহল-আসক্ত করে তোলে এবং যা থেকে আমৃত্যু তাঁর মুক্তি ঘটে না। অন্যদিকে চাকরি না-করে জীবিকা নির্বাহের জন্য শুধু লেখার ওপর

নির্ভর করায় আমৃত্যু দারিদ্র্য হয়ে ওঠে তাঁর নিত্যসঙ্গী। ব্যাধি, আসক্তি ও দারিদ্র্য – এই তিনের পারস্পরিক সম্পর্কের নিবিড়তায় প্রতিটিরই প্রকোপ বৃদ্ধি পায় ক্রমাগতভাবে। এবং তা অনিবার্য করে তোলে তাঁর অকালমৃত্যুকে। এর মধ্য দিয়ে পরিস্ফুটিত হয় একটি নিষ্ঠুর বাস্তবতাও । তা হল, লেখার পারিশ্রমিক দিয়ে বেঁচে থাকা এমন একটি শ্রেষ্ঠ প্রতিভার পক্ষেও সম্ভব হয় না। আর এ কারণেই কিনা জানি না, তিনি প্রতিভার অলৌকিকত্বে নিজের বিশ্বাসহীনতার কথা বলেছিলেন। লেখককে তিনি চিহ্নিত করেছিলেন 'কলম পেষা-মজুর' হিসেবে। সেই মজুরটির শ্রমের মূল্যও যে কত স্বল্প, নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্য নয় মোটেই যথেষ্ট, তা নিজ জীবন দিয়েই তিনি প্রমাণ করে গেছেন।

বাল্য-কৈশোর ও যৌবনে মানিকের মধ্যে লক্ষণীয় ছিল এক ধরনের বেপরোয়া বৈশিষ্ট্য। আবার গ্রন্থপাঠের প্রতিক্রিয়ায় ওরই মধ্যে জন্ম নিয়েছিল নিম্নবর্গীয় জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার এক অদম্য আগ্রহ। এই সূত্রেই তাঁর মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল অর্থনৈতিক শোষণ সম্পর্কে সচেতনতা, এবং সহানুভূতি জন্মেছিল শোষিত-বঞ্চিত-নিঃস্ব মানুষের প্রতি। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে (১৯২৬-২৮) তিনি সংশ্লিষ্ট হয়েছিলেন স্বাধীনতাকামী সশস্ত্র গ্রুপ 'অনুশীলন' দলের সঙ্গে। প্রগতি লেখক সংঘের সংকলনে তাঁর একটি গল্প সংকলিত হয়েছিল ১৯৩৭ সালেই। ১৯৩৮ সালেই তাঁর পঠিত গ্রন্থের তালিকায় মার্কসীয় বস্তুবাদ ও অর্থনীতির অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। 'বঙ্গশ্রী'তে চাকরিসূত্রে (১৯৩৭-৩৮) এর বুর্জোয়া মালিকের বৈশিষ্ট্য ঘনিষ্ঠভাবে দর্শনের সুযোগ পেয়ে তা নিয়ে ১৯৩৯-৪০ সালেই লেখেন *সহরতলি* উপন্যাস। ন্যাশনাল ওয়ার ফ্রন্টের চাকরিসূত্রে (১৯৪৩) তাঁর সংশ্রব ঘটে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সঙ্গে। ১৯৪৩ সালে ফ্যাসিবাদবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘে যোগদানসূত্রে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হন (১৯৪৪) তিনি। এমন বেপরোয়া স্বভাবের মানিক কমিউনিস্ট পার্টির মতো ক্যাডারশৃঙ্খল দলে আমৃত্যু যে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এটা বিস্ময়কর বৈকি। এর মধ্য দিয়ে নিশ্চিতভাবে ফুটে ওঠে সমাজরূপান্তরের সংগ্রামশীল প্রক্রিয়ায় নিজেকে সংযুক্ত রাখার এক অপরিসীম আন্তরিকতা। ১৯৪৯ সালে পিতৃগৃহ বিক্রি থেকে প্রাপ্ত অর্থের পুরোটাই যখন তিনি, প্রবল দারিদ্র্য সত্ত্বেও, পার্টি তহবিলে দান করেন তখন আরেকবার তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

মানিকের শিল্পীসত্তাকে অনেক সমালোচক সুস্পষ্ট দুটি ভাগে ভাগ করে তাঁর সাহিত্য বিচারে অগ্রসর হন। বলা হয়, ১৯৪৪ সালে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হওয়ার পূর্বে ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন তত্ত্বে এবং পরে মার্কসীয় সমাজতত্ত্বে আস্থাশীল হওয়ার কারণে তাঁর সাহিত্য দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। একথা যে পুরোপুরিভাবে অসত্য তা হয়তো নয়। তবে এ ধরনের বিভাজনে তাঁর শিল্পীমানসের যথার্থ পরিচয় অনেক সময়ই অনুদ্ঘাটিত থাকে। প্রথম কথা হল, একটি সাংগঠনিক শৃঙ্খলে তাঁর অন্তর্ভুক্তি কোনো আকস্মিক সিদ্ধান্তের ফল নয়। দ্বিতীয়ত, তত্ত্ব দ্বারা তিনি নিজেকে আমূল বদলিয়েছেন

তা-ও নয়। নিজেকে প্রতিনিয়ত পরিবর্তন করতে করতে তিনি এগোচ্ছিলেন এবং তারই ধারাবাহিকতায় তিনি বিভিন্ন তত্ত্বকে তাঁর সহযোগী করেছেন মাত্র। তত্ত্ব দ্বারা তিনি মোটেই আচ্ছন্ন হননি। মানুষের মনোসংকট ও অর্থনৈতিক সংকটের সমাধান তিনি খুঁজছিলেন। কেননা তিনি লক্ষ করছিলেন, মানুষের নিরাপত্তাহীনতা যেমন আকাঙ্ক্ষার অবদমন থেকে সৃষ্টি হয় তেমনি হয় অর্থনৈতিক সংকট থেকে। তিনি চাইছিলেন মানুষের কল্যাণ, সুস্থতা ও নিরাপত্তা। লেখক হিসেবে সামাজিক দায়বোধ থেকে মুহূর্তের জন্য বিচ্যুত হননি তিনি।

লেখকজীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁর মধ্যে কয়েকটি চেতনা সমানভাবে ক্রিয়াশীল ছিল। যেমন, তিনি সর্বাংশে পরিচালিত হয়েছেন বিজ্ঞানবোধ ও যুক্তিশীলতা দ্বারা। কোনো প্রকার কুসংস্কার, আধ্যাত্মিকতা, অলৌকিক বা অতিলৌকিক চেতনা তাঁর সাহিত্যকে মুহূর্তের জন্য আচ্ছন্ন করতে পারেনি। ভাববাদের চোরাবালিতে কখনও তাঁর সাহিত্য পা রাখেনি। এ-যুগের কথাশিল্পীদের মধ্যে বিজ্ঞানচেতনা থাকা অপরিহার্য বলে তিনি মনে করেছেন। 'কেন'-ধর্মী জীবনজিজ্ঞাসা দ্বারা তিনি কৈশোরকাল থেকে তাড়িত হয়ে জীবনের সকল অর্থ অনুসন্ধান করেছেন বিজ্ঞানসম্মত যুক্তির আলোকে। এই বিজ্ঞানমনস্কতার কারণেই জীবনকে সামগ্রিকভাবে অনুধাবনের আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে, তাঁর মধ্যে জন্ম নিয়েছে গভীর নিরাসক্তিবোধ। ফলে তাঁর মৃত্যুচেতনাও আবেগ-উচ্ছ্বাসহীন, যুক্তিশাসিত।

দ্বিতীয়ত, এরূপ বিজ্ঞানবোধই তাঁর আধুনিকতামণ্ডিত জীবন ও শিল্পবোধ গঠনে সহায়ক হয়েছে। তিনি বিশ শতকীয় আধুনিকতার দুই প্রবল ধারার সঙ্গে একাত্ম হয়েছিলেন। এর একটি ফ্রয়েডীয় মনোবিশ্লেষণ, অন্যটি মার্কসীয় সমাজতত্ত্ব। আবার এরই পাশাপাশি প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর বিপন্ন পরিস্থিতির ফলে সৃষ্ট শূন্যতাবোধ, অনিকেত চেতনা, প্রচলিত মূল্যবোধে অবিশ্বাস, নিরাপত্তাহীনতা প্রভৃতি অনুষঙ্গও তাঁর জীবনবোধে সংশ্লিষ্ট হয়েছে। তাঁর ব্যক্তিজীবনের কিছু অভিজ্ঞতা এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে সমৃদ্ধ করে তুলেছে তাঁর আধুনিকবোধকে। যেমন : এপিলেপ্সির মতো দুরারোগ্য ব্যাধি, তা থেকে সৃষ্ট মৃত্যুচিন্তা, আর্থিক দারিদ্র্য প্রভৃতির সম্মিলিত রসায়নে তাঁর মধ্যে জন্ম নিয়েছিল সার্বক্ষণিক অনিশ্চয়তার এক সুগভীর অনুভূতি। এরই সঙ্গে স্মরণীয় তাঁর জীবনচেতনা ঘিরে আবর্তিত আরো কিছু আধুনিকতার অনুষঙ্গের কথা। যার মধ্যে আছে সমকালসতর্কতা, সমকালীন বিশ্বের দর্শন-বিজ্ঞান-রাজনীতি-অর্থনীতির অগ্রগতি সম্পর্কে সজাগতা, ইহজাগতিকতা, মানবিকতা, প্রগতিতে আস্থা প্রভৃতি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিজ্ঞানচেতনার সঙ্গে তাঁর আধুনিকতার বোধ এভাবেই পরস্পর গভীর সম্বন্ধে তাৎপর্যবহ হয়েছে। এবং এ দুয়ের সহযোগেই বিকাশ লাভ করেছে তাঁর বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি।

নির্মোহ বাস্তবতার রূপকার হিসেবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা কথাশিল্পে নিয়ে এসেছেন সম্পূর্ণ এক নতুন মাত্রা। একথা আগেই বলা হয়েছে যে, বিশ শতকীয়

আধুনিকতার দুই প্রবল ধারাকে তিনি তাঁর শিল্পীসত্তায় গভীরভাবে আত্মস্থ করেছিলেন। বিশ শতকের প্রথমার্ধে মানব

মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে ফ্রয়েড অ্যাডলার ইয়ুং-এর যুগান্তকারী আবিষ্কারসমূহের আলোকে তিনি মানুষকে নতুনভাবে পাঠ করেছেন তাঁর কথাসাহিত্যে। অন্যদিকে ১৯১৭-এর রুশ বিপ্লব মার্কসীয় সমাজতত্ত্ব সম্পর্কে বিশ্ববাসীর মনে যে বিপুল আস্থা সৃষ্টি করে তারই প্রণোদনায় তিনি উন্মোচন করেছেন সমাজবাস্তবতার নতুন রূপ ও স্বরূপ। জীবনজিজ্ঞাসার এই দুই দিক তাঁর শিল্পীমানসে গভীরভাবে প্রোথিত হওয়ায় তাঁর কথাশিল্পে আমরা বাস্তবতার এক নতুন আলোর সন্ধান পাই। এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, মানিক কল্লোলীয় কথাসাহিত্যিকদের ভাবোচ্ছ্বাসময়তা ও জনজীবনের মর্মমূলবিচ্ছিন্নতা সম্পর্কে শুধু সচেতন ছিলেন না, ছিলেন রীতিমতো সমালোচনামুখর। তাদের সাহিত্যে প্রতিফলিত বাস্তবতাকে প্রকৃত জীবনধারায় অনুসন্ধান করতে গিয়ে তিনি হতাশ হতেন। সুতরাং নিজ সাহিত্যে জীবন ও সমাজবাস্তবতাকে তার যথার্থ স্বরূপসহ পরিস্ফুটিত করতে মানিকের নীতিগত আগ্রহ ছিল সমধিক। এ-কারণেই তাঁর সাহিত্যে লক্ষ করি অন্তর্বাস্তবতা ও বহির্বাস্তবতার এক অপূর্ব সমন্বয়। ফলে বহির্জাগতিক জীবনচিত্রণের পাশাপাশি ব্যক্তির অন্তর্মানস উন্মোচনেও মানিক সমান গুরুত্ব আরোপ করেন।

কোনো ঘটনার বিবরণ উপস্থাপন কিংবা কোনো সংকটের চিত্র অঙ্কনের পরিবর্তে ব্যক্তিমানস ও সমাজমানসে ওইসবের অভিঘাত ও আলোড়নের স্বরূপ উন্মোচনই মানিকের শিল্পবোধের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য। এরূপ বৈশিষ্ট্যের মূলে রয়েছে তাঁর সমগ্রতাস্পন্দী জীবনভাবনা। মানিক মনে করতেন, সমাজ ও জীবনের সত্য কেবল বহির্জগতে নেই, ব্যক্তির অন্তর্জগতেও রয়েছে এর অধিষ্ঠান। সে-কারণে আমৃত্যু তিনি সমাজবাস্তবতা ও মনোবাস্তবতার যথার্থ সামঞ্জস্যবিধানের চেষ্টা করে গেছেন।

সুতরাং মানিকের জীবন ও শিল্পবোধের স্বরূপ অনুধাবন করতে হলে তাঁর জীবনদৃষ্টির এই তিন বৈশিষ্ট্যের দিকেই অর্থাৎ বিজ্ঞানমনস্কতা, আধুনিকতা ও বাস্ত বতামূলক চেতনার প্রতিই মনোযোগী হতে হবে। কেননা এই তিন প্রবণতাই লেখকজীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁর সাহিত্যে লক্ষণীয়। এক্ষেত্রে ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন তত্ত্ব কিংবা মার্কসীয় সমাজতত্ত্বের প্রভাবের বিষয়টি মানিকের জীবনে কেবল উপরিতলের বিষয় বলেই মনে হয়। কেননা ১৯৪৪-পূর্বকালে যেমন তিনি মনোবিশ্লেষণের পাশাপাশি অর্থনৈতিক শোষণসহ সমাজবাস্তবতার রূপায়ণকে উপেক্ষা করেননি, তেমনি ১৯৪৪-পরবর্তীকালেও রাষ্ট্রীয়-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক শোষণ-আলোড়ন-বিক্ষোভের বাস্তবতা তুলে ধরার পাশাপাশি ব্যক্তির মনোবাস্তবতার রূপান্ত রশীলতাকেও করেননি অবহেলা। তাহলে ওই দুই তত্ত্বের প্রভাব তাঁর সাহিত্যে কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে সেটা দেখার বিষয়। বিশেষত, মার্কসীয় সমাজবীক্ষার আলোকে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে যেসব পরিবর্তন সূচিত হয়েছে সেটাই লক্ষণীয়। ব্যক্তিজীবনে

লিবিডোর সর্বময় কর্তৃত্বের ধারণাটি দ্বিতীয় পর্বে অবলুপ্ত হয়ে সেখানে প্রাধান্য অর্জন করেছে সমাজ নিয়ন্ত্রণে অর্থনৈতিক কর্তৃত্বের ধারণা।

পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য দারিদ্র্যের রূপ অঙ্কনের বিষয়টি। দারিদ্র্য তাঁর কাম্য ছিল না, কিন্তু দরিদ্রজীবনের প্রতি মমতা তাঁর ছিল। ফলে এই জীবনের মর্মগাথা পূর্বাপর চিত্রিত হয়েছে তাঁর সাহিত্যে। এই জীবনের আর্থিক দৈন্যজনিত সংকীর্ণতা, গ্লানি কিংবা ক্লেদ সম্পর্কে তাঁর মধ্যে ছিল না কোনো বিদ্বেষ কিংবা সমালোচনা। বরং এই শ্রমসংশ্লিষ্ট জীবনের মধ্যেই তিনি প্রথম পর্বে লক্ষ করেন সুস্থতা ও বলিষ্ঠতা। আর্থিক দৈন্য যে নানা প্রকার হীনতা ও প্রতিভা বিকাশের স্বাভাবিক অন্তরায় এ সম্পর্কে এ পর্বে তাঁর মধ্যে ছিল না কোনো সচেতনতা। ক্রমবর্ধমান সমাজসতর্কতা ও মার্কসীয় ভাবাদর্শে আস্থা স্থাপনের মধ্য দিয়ে তিনি চিরশোষিত শ্রমঘনিষ্ঠ এই জীবনের মহত্ত্ব উপলব্ধিতে সক্ষম হন। সভ্যতা নির্মাণে চিরকাল এই শক্তির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার বিষয়টি তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ফলে বঞ্চিতজনদের প্রতি স্বাভাবিক সহমর্মিতা শেষ পর্যন্ত সভ্যতা নির্মাণকারীদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধায় পর্যবসিত হয়।

দ্বিতীয়ত, মানিক নিজে মধ্যবিত্ত শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হয়েও এই শ্রেণির নানা প্রতারক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ছিলেন সমালোচনামুখর। মানিকের দৃষ্টিতে, এই শ্রেণির মধ্যে রয়েছে নানা ক্লেদ, গ্লানি, ও অন্তঃসারশূন্যতা। মধ্যবিত্ত তার দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতাকে সবসময় গোপন করে, কায়িক শ্রমজীবীর চেয়ে নিজেকে শ্রেষ্ঠ ভাবে। কিন্তু প্রতিনিয়ত আর্থিক সামর্থ্যের অভাবে তার স্বপ্ন থাকে অচরিতার্থ, আকাঙ্ক্ষা থাকে অপূর্ণ। ফলে নিত্য-অবদমনের প্রক্রিয়ায় তার মধ্যে যেমন জন্ম নেয় মনোবিকার তেমনি এই বিকারের উত্তাপেই নানারূপ অসুস্থ প্রবণতাকেও সে আহ্বান করে। স্বশ্রেণির এই মুখোশ-পরা মানসিকতাকে, ক্ষতে-ভরা মুখকে সাধারণ পাঠকের সামনে নির্মমভাবে উন্মোচন করার মধ্যেই নিজের কর্তব্য বোধ করেছিলেন মানিক। তাঁর ধারণা ছিল, এই প্রক্রিয়ায়ই নিজ শ্রেণিকে সুস্থ করে তোলা সম্ভব। কিন্তু মার্কসীয় সমাজতত্ত্ব অধ্যয়নের পর তিনি উপলব্ধি করেন যে, ওইটি যথার্থ পথ নয়। বরং তিনি লক্ষ করেন, মধ্যবিত্ত তার শ্রেণিগত অহংকে বিসর্জন দিয়ে কায়িক শ্রমজীবীর মানসিকতার সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে তুললেই সুস্থ হয়ে ওঠে। এইরূপ উপলব্ধির ফলে স্বশ্রেণির প্রতি কঠোর সমালোচনা ও অশ্রদ্ধা পরিহার করে মানিক মধ্যবিত্তকে কায়িক শ্রমে সংশ্লিষ্ট করে তুলে তাদের প্রতি হয়ে ওঠেন শ্রদ্ধাভাবাপন্ন।

তৃতীয়ত, সামাজিক ও অর্থনৈতিক শোষণ সম্পর্কে মানিক লেখকজীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সচেতন ছিলেন। স্বল্পসংখ্যক লোকের নিষ্ঠুর শোষণ বেশিরভাগ মানুষের অপরিমেয় দুর্দশার কারণ – এ সত্যটি তাঁর সামনে উন্মোচিত হয়েছিল শুরুতেই। তাছাড়া শোষণ ও প্রতারণাই যে বিত্ত সৃষ্টির একমাত্র উপায় সে-সম্পর্কেও তাঁর ধারণা ছিল অতিশয় স্বচ্ছ। মানুষের কল্যাণকামনাই যেহেতু মানিক-সাহিত্যের

প্রধান প্রতিপাদ্য সেহেতু শোষিত বিত্তহীন মানুষের প্রতি প্রবল সহানুভূতি তাঁর কথাসাহিত্যে পূর্বাপর উপস্থিত। তবে এই শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-বিক্ষোভের চিত্র আমরা তাঁর প্রথম পর্বের সাহিত্যে কমই পাই। এ পর্বে প্রায় সব ক্ষেত্রেই বঞ্চিতজনদের নিরুপায়ত্বের চিত্রই হয়ে উঠেছে মুখ্য। এই শোষণ-বঞ্চনা থেকে মুক্তির যথাযথ উপায় সম্পর্কে এ পর্বে তাঁর মধ্যে কোনো স্বচ্ছ ধারণা গড়ে ওঠেনি। মার্কসীয় সমাজতত্ত্বে আস্থাশীল হওয়ার পর মানিকের মধ্যে মুক্তির পথ সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট চেতনা সৃষ্টি হয়। মানিক এই উপলব্ধিতে পৌঁছেন : শোষিত-বঞ্চিতজনদের সমষ্টিবদ্ধ আন্দোলন-সংগ্রাম-বিক্ষোভের মধ্যে তাদের মুক্তি নিহিত। ফলে তাঁর উত্তরপর্বের সাহিত্য শ্রমজীবীদের যূথবদ্ধ প্রতিবাদ-প্রতিরোধ ও লড়াইয়ে মুখর। বিচ্ছিন্নতার মধ্যে দুর্বলতা আর ঐক্যের মধ্যেই শক্তি। শাসক ও শোষকশ্রেণির ক্ষমতা যত নিরংকুশই হোক, দুর্বল শোষিত মানুষের সম্মিলিত শক্তির কাছে তাঁর পরাজয় অনিবার্য – এই চেতনা মানিকের উত্তরপর্বের সাহিত্যকে প্রাণবন্ত ও গৌরবদীপ্ত করেছে।

এখানে স্মরণীয় যে, একটি সুস্থ, সুন্দর ও কল্যাণময় জীবনের আকাঙ্ক্ষাই মানিককে ফ্রয়েডীয় মনোবিশ্লেষণ ও মার্কসীয় সমাজবীক্ষার প্রতি আকৃষ্ট করে। মানুষের অস্বাভাবিক মনস্তত্ত্বের কারণ উদ্ঘাটনসূত্রে মানবমনের গূঢ় গভীর রহস্য উন্মোচনে তিনি ব্রতী হন। অতঃপর মনোবিকারের উৎস সন্ধান করতে গিয়ে তিনি উপলব্ধি করেন যে, তা শুধু ব্যক্তির লিবিডোসংকট বা অবদমনের মধ্যেই নিহিত নেই, শোষণ-বৈষম্যক্লিষ্ট সমাজমানসের গভীরেও তা প্রোথিত। ফলে শোষণ-বৈষম্যমুক্ত একটি সমাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মানবজীবনের সুস্থতা সৃষ্টিই হয়ে ওঠে তাঁর একান্ত কাম্য। এভাবে এক কল্যাণকর জীবনের আকাঙ্ক্ষায় তিনি ব্যক্তির মনোব্যাধি নিরাময়ের সূত্র ধরে ক্রমশ যুক্ত হয়ে পড়েন সমাজকে সুস্থ করে তোলার এক বৃহত্তর কর্মপ্রয়াসে। মানুষের যে দ্বিবিধ সত্তা – অর্থাৎ ব্যক্তির ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষাপ্রধান স্বাধীন সংকীর্ণ জীবন ও সমাজসংশ্লিষ্ট নিয়মশাসিত বৃহত্তর জীবন – এ

সম্পর্কে ক্রমেই অধিক মাত্রায় সচেতন হয়ে ওঠেন তিনি। ব্যক্তি ও সমষ্টির মধ্যেকার সম্পর্কের নিবিড়তা লক্ষ করেই মানিক এর কোনোটিকে অবজ্ঞা করেননি। ফলে প্রথম দিককার মনোবিশ্লেষণ পর্বে যেমন তাঁর শিল্পবোধ সমাজবিযুক্ত নয় তেমনি রাজনীতিসচেতন পর্বেও ব্যক্তির ভূমিকা তাঁর কাছে গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে না। মূলত তিনি ব্যক্তি ও সমষ্টি, মনোজগৎ ও সমাজবাস্তবতা– এই দুইকে অপূর্ব দক্ষতায় সমন্বিত করেছেন। এ দুয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধনের মধ্যেই তিনি শিল্পের সার্থকতা খুঁজেছেন। ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন তত্ত্ব ও মার্কসীয় সমাজবীক্ষাকে তিনি নিজ জীবনাদর্শে আত্তীকৃত করেছেন। ব্যক্তিমন ও সমাজচৈতন্যের এরূপ সার্থক সমন্বয় সৃষ্টির কল্যাণকর প্রচেষ্টায় মানিক বাংলা সাহিত্যে যেমন ব্যতিক্রমধর্মী তেমনি অনন্য ও স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত।

মো. নূরুল আমিন

ভূমি-ব্যবস্থাপনা ও অর্থনৈতিক মুক্তি

বাংলাদেশে জনসংখ্যা যে হারে বাড়ছে সে হারে বসবাসযোগ্য জমি নেই। ফলশ্রুতিতে কৃষি ও আবাদী জমি কমছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে শহর কিংবা গ্রামে কৃষি ও আবাদী জমি বাসস্থানের জন্য প্রতিনিয়ত ব্যবহৃত হচ্ছে। বেকারত্বের তুলনায় দেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ একেবারেই অপ্রতুল। রাজধানী ঢাকা শহর কর্মসংস্থানের অন্যতম প্রাণকেন্দ্র হওয়ায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে লোকজন দৈনন্দিন এখানে এসে ভিড় জমাচ্ছে। কোনোভাবেই এই বাড়তি জনসংখ্যার জন্য ঢাকা শহরে বাসস্থান ও জমির সংকুলান হচ্ছে না। মানুষ রাস্তায়, বস্তিতে, গলিতে এবং বিভিন্ন অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বাস করছে। ফলে মানুষের বসবাসের মান অনেক নীচে নেমে গেছে। কেননা ময়লা আবর্জনা, দুর্গন্ধ, ধোঁয়া, সুয়্যারেজ লাইন, অসহনীয় যানজট, শব্দ দূষণ ইত্যাদি সমস্যা ঢাকা শহরকে অস্বাস্থ্যকর করে রেখেছে। নির্দিষ্ট কোনো বাসস্থান না থাকায় বিশেষ একটি জনগোষ্ঠী ভাসমান অবস্থায় ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্থানে বসবাস করছে। যেমন- পার্ক, রেল স্টেশন, রেল লাইনের ধার, ফুটপাত, রাস্তার ধার আইল্যান্ড ইত্যাদি খোলা জায়গায় এরা মানবেতর জীবন যাপন করতে বাধ্য হচ্ছে। জায়গা এবং বাসস্থানের অভাবে কলকারখানার শ্রমিক, কর্মজীবী, চাকরিজীবী এবং পেশাজীবীরা নিরুপায় হয়ে শুধুমাত্র জীবিকা নির্বাহের তাগিদে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও বাসস্থানে থাকতে বাধ্য হচ্ছে। ফলে মানুষের গড় আয়ু কমছে এবং অসুস্থতা, একঘেয়েমি, অনীহা, অপরাধচক্র, অকাল মৃত্যু দিন দিন বাড়ছে। যার ফলে দেশে নেমে আসতে নীরব দুর্ভিক্ষ ও বেকার সমস্যা। মানুষ এ বিভীষিকাময় অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে চায়। যদি অন্য কোথাও গ্রাম্য এলাকায় বা খোলা জায়গায় কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা থাকত তাহলে ঢাকা শহরের অলি-গলি এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ছেড়ে মানুষ সেই নির্মল ও স্বাস্থ্যকর গ্রামীণ পরিবেশে চলে যেত যেখানে তারা প্রাণভরে বিশুদ্ধ বাতাসের নিঃশ্বাস নিতে পারবে।

রাজধানী ঢাকা-র কথা শুধু চিন্তা করলে চলবে না। পুরো বাংলাদেশের কথা মাথায় রাখতে হবে। যেহেতু দেশে সীমিত সম্পত্তি এবং জনসংখ্যা অনেক বেশি এবং দিন দিন জনসংখ্যা আরও বাড়ছে, তাই বাসস্থানের জন্য প্রতিনিয়ত আবাদী জমি ব্যবহারের জন্য তা কমে আসছে। ফলে ভবিষ্যতে আবাদী জমির অভাব ও কৃষিদ্রব্যের সংকট দেখা দেবে এবং দেশে দুর্ভিক্ষ নেমে আসবে। আর একথা আমাদের ভাবা উচিত যে,

ভবিষ্যতে ঢাকা শহর-এর করুণ অবস্থা শুধু ঢাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। পুরো বাংলাদেশেই তা বিস্তার লাভ করবে।

মানুষ বাচাঁও, জমি বাচাঁও, আবাসন শিল্প গড়– শ্লোগানকে সামনে রেখে স্বাস্থ্যসম্মত বাসস্থান ও পরিবেশ তৈরি এবং আবাদী জমির ব্যবহার কমাতে হলে ঢাকা শহরসহ বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে ন্যূনতম একটি করে হলেও বহুতল বিশিষ্ট আবাসিক ভবন নির্মাণ করে কৃষক, শ্রমিক, দিনমজুর, চাকরিজীবী সকলের জন্য একটি স্বাস্থ্যকর বাসস্থান নিশ্চিত করতে হবে। যেখানে চিত্তবিনোদন ব্যবস্থা, গার্ডেন, সুইমিং পুল, শিশু কিশোর এবং নতুন প্রজন্মের জন্য খেলাধুলার স্থান, কর্মসংস্থানের জন্য কৃষি খামার, মুরগির খামার, মৎস্য হ্যাচারি, নানা ধরনের ফল ও সবজির বাগান থাকবে এবং

সেই উৎপাদিত পণ্য বিদেশে রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব। যার ফলশ্রুতিতে একটি কৃষি বিপ্লব ঘটানো সম্ভব। তাতে দেশে ঋণ খেলাপি অনেক কমে আসবে, দেশ আর্থিকভাবে

স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে, কাজের প্রতি আগ্রহ বেড়ে যাবে। তাই এখনই সময় এসেছে সরকারি এবং বেসরকারিভাবে আবাসন শিল্পে স্বল্প সুদে ঋণ এবং অনুদান প্রদান করার। জনগণের বাসস্থান, কর্মসংস্থান, কৃষি জমি রক্ষার কথা ভেবে আবাসন শিল্পকে উন্নয়নের জন্য সরকারের যথাশীঘ্রই আন্তরিকভাবে এগিয়ে আসা একান্ত প্রয়োজন।

দেশের চরাঞ্চলের উন্নয়ন, কৃষিখাতের ঘাটতি পূরণ এবং খাদ্য সামগ্রী বিদেশে রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব। চরাঞ্চলে ভূমিহীনদের মধ্যে ভূমি লিজ না দিয়ে ১০০ থেকে ৩০০ একর জমি একত্রে নিয়ে একটি প্রকল্প নির্ধারণ করে দেশের বড় বড় ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের নিকট তা বিক্রয় করে বিক্রয়লব্ধ অর্থে ভূমিহীনদের জন্য আবাসন পল্লী গড়ে তুলতে হবে। ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিরা ঐ চরাঞ্চলের প্রকল্প ক্রয় করে বিভিন্ন ধরনের উৎপাদন, উন্নয়নমূলক কিছু জোন যেমন- শস্য জোন (ধান, সরিষা, গম চাষ), মৎস্য হ্যাচারি ও মৎস্য চাষ জোন, গরুর খামার ও মুরগির খামার জোন, অন্যান্য কৃষি খামার জোন ইত্যাদি আধুনিক এবং বৈজ্ঞানিকভাবে গড়ে তুলে উৎপাদিত পণ্যদ্রব্য দেশের অভ্যন্তরের চাহিদা পূরণের পাশাপাশি বিদেশে রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের মাধ্যমে প্রতিটি পরিবার, গ্রাম তথা দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে সমৃদ্ধি আনতে পারবে। সরকারিভাবে ভূমিহীনদের মাঝে গড়পড়তাভাবে ভূমি লিজ বা বিতরণ করলে ঐ সব চরাঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের নতুন নতুন অপরাধমূলক সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড সংঘটিত হবে; তৈরি হবে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, দেশ হয়ে পড়বে অর্থনৈতিক ভাবে দুর্বল।

ভূমিহীনদের ভূমি দিলে তারা উৎপাদনমুখী এবং উন্নয়নমূলক কোনো কর্মকাণ্ডই সম্পাদন করতে পারবে না। চরাঞ্চল তথা দেশের লাভজনক কোনো উপার্জন করাও তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। ভুমিহীনরা পুষ্টিহীনতার কারণে স্বাস্থ্যের দিক থেকে দুর্বল, নানা সমস্যায় জর্জরিত এবং বিভিন্ন ভাবে অমানবিক জীবন যাপন করে। ফলে ঐ সব চরাঞ্চল আরও বেশি অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়বে ও অনুন্নত থেকে যাবে। আর এখন যদি সরকার ঐ সব ব্যবসায়ী এবং শিল্পপতিদের মাঝে প্রকল্প করে চরাঞ্চলের ভূমি বিতরণ বা বিক্রয় করেন তাহলে তারা ভুমিহীনদের আবাসনের মাধ্যমে দেশের বেকার সমস্যা সমাধান, অর্থনীতিকে সমৃদ্ধশালী, রপ্তানি এবং উৎপাদনমুখী করে দেশকে গড়ে তুলতে পারবে। ফলে দেশ বিশ্বের কাছে অর্থনৈতিকভাবে মাথা উচু করে দাঁড়াতে পারবে।

আমাদের মনে রাখতে হবে শুধু ঢাকা শহরই নয়, পুরো বাংলাদেশকে রাজধানী শহরের মতো একটি উন্নত শহর হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। শহরভিত্তিক জীবনযাত্রা মানুষের আয় বৃদ্ধি করে এবং দেশের অর্থনৈতিক অবকাঠামো উন্নয়নে উল্লেখ্যযোগ্য ভূমিকা রাখে। সরকারি এবং বেসরকারিভাবে আবাসন শিল্পের প্রতি সহযোগিতার হাত বৃদ্ধি করে ও স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান প্রক্রিয়ায় জনগুরুত্বপূর্ণ আবাসন শিল্পকে অনুপ্রাণিত করতে পারলে, বাংলাদেশ একটি উন্নত দেশ হিসেবে বিশ্বের দরবারে পরিচিতি লাভ করতে সক্ষম হব। এবং এভাবে কেবল সঠিক ভূমি-ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অতি দ্রুত আমাদের অর্থনৈতিক মুক্তি ঘটানো সম্ভব।

গ ল্প

শা হ্ না জ মু ন্নী

....

বহুবার বলা গল্প

একটা ঠাণ্ডা ভেজা স্যাঁতস্যাঁতে মাটির গর্তে ততোধিক স্যাঁতস্যাতে ঠাণ্ডা ভয় নিয়ে মাথা নিচু করে উবু হয়ে বসে আছি। বসে আছি মানে আরো কয়েকজনের সাথে আমাকেও বসিয়ে রাখা হয়েছে। যেটাকে মাটির গর্ত বলছি আসলে সেটা মাটি খুঁড়ে তৈরি করা একটা বাঙ্কার। অনেকটা কবরের মতো থমথমে অন্ধকার। বাঙ্কারের ভেতর ঘাপটি মেরে বসে শুনতে পাচ্ছি দূরে কোথায় যেন থেমে থেমে গুলির আওয়াজ হচ্ছে। এরপর কী যে হবে আন্দাজও করতে পারছি না। কালকে রাতে ওরা আমাকে বাসা থেকে ধরে এনেছে। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর পরই আমি আখাউড়া সীমান্ত পাড়ি দিয়ে চলে গিয়েছিলাম ইন্ডিয়া। গত রাতে, কেবল গত রাতেই দেশে ঢুকেছিলাম হাইকমান্ডের নির্দেশে কিছু প্রচারপত্র বিলি করব বলে, মা'ও অসুস্থ ছিল, ভেবেছিলাম সেই সাথে মাকেও দেখে আসা যাবে .. কিন্তু কিভাবে যে খবর পেয়ে গেল ওরা ...। ভাগ্যিস আমার ছোট বোনটা বিপদ বুঝে আগে ভাগেই রান্নাঘরের কোনো অদেখা জায়গায় প্রচারপত্রগুলো লুকিয়ে ফেলতে পেরেছিল। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও ওরা সন্দেহজনক কিছু খুঁজে পায়নি, তারপরও বন্দুকের নল বুকে চেপে, ধরে এনেছে ওদের ক্যাম্পে, ক্যাম্প মানে তো আমাদের সরকারি কলেজের সেই অতি চেনা টানা লম্বা ক্লাসরুমগুলো, আর কলেজের বিশাল সবুজ সমতল মাঠ খুঁড়ে ওরা বানিয়েছে বাঙ্কার। সেই বাঙ্কারের ভেতর এখন আমার পাশে বসে থরথর করে কাঁপছেন আর জোরে জোরে আল্লাহকে ডাকছেন এক বৃদ্ধ। এক ফাঁকে আমার কানের কাছে মুখ এনে বৃদ্ধ ফিসফিস করেন,

'বাবারে আমার বয়স বেশি, আমি বুইড়া বেডা, আমারে এরা মারতো না, আমার পেট পুড়তাছে তোমার লাইগ্যা ... এরা খালি জোয়ান বেডারারে মারে ... আল্লা মাবুদ ... জালিমের জুলুম কবে বন্ধ করবা আল্লা ... '

বৃদ্ধের কথার উত্তর দেই না। আসলে উত্তর খুঁজেও পাই না, কবরের অন্ধকারে ঝিমুতে ঝিমুতে স্বপ্ন দেখি ... সকাল হওয়ার স্বপ্ন ... আসলে স্বপ্ন না দুঃস্বপ্ন ... দুঃস্বপ্নই হবে... নয়তো গফরগাঁ থেকে ধরে আনা ওই কিশোরের মৃত্যুচিৎকার আমাকে

শুনতে হল কেন, বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে তার জান বের করে আনার সেই নৃশংস দৃশ্য দেখতে হল কেন ...'আরে ভাই ছেড়াডা বিরাট বেত্তমিজ, পুল উড়াইতে গিয়া ধরা পড়ছে, সেইটা আবার স্বীকারও করছে' কারা আমার পাশে দাঁড়িয়ে এসব কথা বলছে আমি বুঝতে পারি না, এরা তাদের শুকনা শরীরের ওপর কেমন একটা ঢলঢলে উদ্ভট ইউনিফর্ম পরে আছে। কয়েকজন এসে আমাকে টেনে নিয়ে গেল ব্রিগেড কমান্ডারের কাছে, 'হারামখোর, তুম টিচার হো, তুম লোক বহুত হারামী, ইয়ে মুল্‌কমে ছাত্র লোগকে জয় বাংলা শিখাতা ...তুম লোগ শালা বাইনচোত... ছাত্র লোগকে জ্বালাপুড়া শিখাতা ' কমান্ডার গলার রগ ফুলিয়ে চিৎকার করতে থাকলেও আমি শূন্য চোখে তাকিয়ে থাকি। সে চোখ গরম করে হাতের বন্দুক নাড়িয়ে প্রশ্ন করে,'হেজবুল্লাহ চৌধুরীকা ঘরমে কিসনে বোমা মারা? বাতাও ...' হেজবুল্লাহ চৌধুরী আমাদের শহরের জেলা মুসলিম লীগের সভাপতি। আমি তখনো জানিনা তার বাড়িতে বোমা মারা হয়েছে। ওর প্রশ্ন শুনেও তাই আমি চুপ করেই ছিলাম, সে হয়তো আরো কিছু প্রশ্ন করত, হয়তো আমার নীরবতায় রেগে উঠে তক্ষুনি আমার পেটে ধারালো বেয়নেটই চার্জ করে ফেলত কিন্তু কেউ-একজন এসে ওর কানে কানে কী যেন বলায় সে আমাকে ছেড়ে অন্যদিকে ছুটতে শুরু করে।

সাময়িক ছাড়া পেয়ে আমি এসে ক্যাম্পের আঙ্গিনায় দাঁড়াই, একটা ধূসর সবুজ জিপ থেকে মেরে আনা, ধরে আনা, আহত, রক্তাক্ত, হাত-পা বাঁধা দিশেহারা লোকগুলোকে নামানো হয়, সৈন্যরা উল্লাস করে 'মুকতি আ-গিয়া, মুক্তি আ-গিয়া ..' আমি বিস্ফোরিত চোখে ওদের সেই 'মুক্তি শিকার' প্রত্যক্ষ করি। ভালুকার মল্লিকবাড়ি থেকে ধরে এনেছিল একজনকে, বেয়াকুফ টাইপের নিরীহ আর বুনো গ্রাম্য লোকটাকে ওরা যখন জোর করে ধরে গাছের সাথে বাঁধছিল, তখনও সে চিৎকার করে বলছে,

'এইডা কি করোইন, এইডা কি করোইন, বানধইন কেরে, আমি কিতা করছি?'

কেউ তার চিৎকারকে গ্রাহ্য করে না বরং কলেজের বারান্দার রেলিং ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে থাকা প্রাচীন আমগাছটার সাথে আরো শক্ত করে দড়ি দিয়ে ওকে বাঁধতে থাকে। লোকটা এবার ওদের দিকে তাকিয়ে বলে, 'আস্তে বান্ধোইন, ও ভাই আস্তে ... দুক্ক পাইতাছি ... ও ভাই ...'

এত দুঃখের মধ্যেও আমার হাসি পায়, বেকুবটা কি কিছুই বুঝতেছে না? আরে গাধা, ওরা তো ইচ্ছা করেই তোকে ব্যথা দিচ্ছে, আরো কত ব্যথা না জানি তোর কপালে লেখা আছে ...

বোকা লোকটা এবার আমার দিকে তাকায়, একদম আমার চোখে চোখে, বলে,

'ও স্যার, দেওখ্যাইনছে, এরা আমারে কেরে বান্ধে? আমি কি করছি ...'

আমি চোখ ফিরিয়ে নেই, যেন ওর কথা শুনতেই পাইনি। কিন্তু একসময় আমাকে শুনতেই হয় কেননা জিজ্ঞাসাবাদের সময় ওদের উর্দুর সামনে লোকটা তার গ্রামের

ভাষায় চেঁচাতে থাকলে ক্যাম্প কমান্ডার আমাকে তলব করে ওর ভাষা তর্জমা করে দেয়ার জন্য ।

'স্যার, বুঝ্‌জইন, বেইন্না বেলা আমি ক্ষেতে লাঙ্গল দিতাছ্‌লাম, আত্‌কা দেহি বাড়ি ঘরে দিছে আগুন ..আমি দৌড়ায়া বাড়িত্‌ গেছি, গিয়া আমার মা, বউ আর বাচ্চাটারে নিয়া খালি ঘর থেইক্যা বাইর হইছি, সামনে দেহি মেলিটারি, হেরা আমারে ধইরা আনলো ভালকা থানাত্‌, আমার বউ আর মা'ডারে জানি কুনদিকে লইয়া গেলোগা জানি না ... ও স্যার, আমার বউডা কই আছে, আমার মা'ডা কই আছে? এরারে একটু জিগাইনছে ...'

কথার মাঝখানেই একজন এসে হঠাৎ করে ওর মুখে চোখে সজোরে চড় মারলে তার মাথাটা স্প্রিংয়ের মতো ঘুরে যায়, পর পর কয়েকবার চড় খেয়ে ওর মুখ থেকে রক্ত বেরিয়ে আসে, বেকুব লোকটা বোধহয় এখন চিৎকার করতেও ভুলে গেছে, শূন্য চোখে অবাক হয়ে আমার দিকে কেমন ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে, আমি আবার চোখ ফিরিয়ে নেই । লোকটা মাটিতে পড়ে পড়ে গোঙ্গায়, 'স্যার গো স্যার, আইজ সাতাইশ্যা রমজান, আমারে এরা ছাইড়া দিলে হাইট্টা গেলেও ঈদডা পাইতাম ... এরারে বুজায়া একটু কইন না স্যার আমারে ছাইড়া দিতো ...হায়রে আমার বউডা ... আমার মা-ডা না জানে কই আছে গো ..ও স্যার ..আমি তো কিছু করছি না...' সম্ভবত ওর মুখ বন্ধ করতেই এক সোলজারের কাঁটাওয়ালা বুট আছড়ে পরে ওর রক্তাক্ত মুখে, পিঠে, বুকে, পেটে একবার-দুবার অসংখ্যবার, গ্রাম্য বোকাটা তবু বার বার অবুঝের মতো চিৎকার করে, 'আমারে মারোইন কেরে... কিতা করছি আমি .. ও আল্লা ... ও মা .. আমারে কেরে মারে গো ...'

একসময় তার সেই রক্তাক্ত বিকৃত গোঙ্গানিও থেমে যায় ।

এক পশ্চিম পাকিস্তানী সিভিলিয়ান যে কিনা ক্যাম্পে সৈন্যদের জন্য রাঁধা-বাড়ার কাজ করত এবং গল্পচ্ছলে আমাকে জানিয়েছিল ওর বাড়ি নাকি কাশ্মিরে, ওইদিন রাতের বেলা সে-ই দূর থেকে আমাকে দেখাল আঙুল তুলে, 'ওই দেখ হাবিলদার আলমগীর' আমি দেখি লম্বা দোহারা চেহারা শক্তসামর্থ্য এক মোছওয়ালা জওয়ান আমার সামনে দিয়ে অন্ধকার মাড়িয়ে মচ্‌ মচ্‌ করে হেঁটে যায় । কাশ্মিরী রাঁধুনি তখন আমার কানে কানে ফিসফিস করে, 'দেখিয়ে স্যার, দেখিয়ে উসকো, ও আদমী নেহি, ও জল্লাদ হ্যায়' ।

প্রতিদিন সন্ধ্যায় ইফতার করে এসে ও মানুষ জবাই করে । তোমার দেশী ওই বেয়াকুফ আদমীটাকে রাতের আঁধারে ও-ই তো জবাই করে দিয়েছে । আর সেই বুড়োটা, আমাকে নিয়ে যার চিন্তার শেষ ছিল না ... সে-ও নাই ? না, সে-ও জবাই হয়ে গেছে । জবাই করলে অনেক সুবিধা, বুলেট বাঁচে আর তেমন কোনো শব্দ হয় না । ওই যে নদী দেখছ, তাতে জেলাবোর্ডের যে স্পিডবোটটা আছে না, সেই বোটে তুলে নিয়ে লাশগুলো ওরা নদীতে ফেলে দেয়, আর নদীর স্রোতে ভাসতে ভাসতে লাশগুলো

কাপাসিয়া হয়ে বুড়িগঙ্গায় চলে যায়। জীবিত আর ভীত মানুষেরা, পলাতক আর আতংকিত মানুষেরা তখন তাদের দেখে প্রথমে চিনতে পারে না ... চিনবে কিভাবে? পানিতে থাকতে থাকতে মানুষের মরা শরীর ওঠে ফুলে ... নদীর মাছরা ঠোকর দিয়ে খেয়ে নেয় নাক, চোখ, পেট, পেটের ভেতরের নাড়িভুড়ি– এই কারণে ওই সময় মানুষেরা নাকি নদীর মাছ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছিল, মাছের টুকরা মুখে দিলে তখন নাকি তাদের মনে হত মাছ না, মরা মানুষের পচে যাওয়া মাংশ খাচ্ছে ...

ওই সময়েরই ঘটনা, আমাদের গ্রামের মইন্যা চাচা আগের দিন সন্ধ্যায় তার ধান ক্ষেতের অল্প পানিতে বড়শির মধ্যে একটা ছোট্ট ব্যাঙ গেঁথে ফেলে রেখেছিল, মাছ-টাছ কিছু যদি ধরা পড়ে এই আশায়, পরদিন ভোর সকালে মইন্যা চাচা ক্ষেতে এসে দেখে তোলপাড় কাণ্ড ঘটে গেছে। সারা
ক্ষেত তছনছ অবস্থা, যেন কোনো আহত মানুষ সারা রাত এই ধানক্ষেতে ইচ্ছেমতো গড়াগড়ি খেয়েছে, দাপাদাপি করেছে। ধানক্ষেতের সেই দুমড়ানো-মুচড়ানো চেহারার সামনে দাঁড়িয়ে মইন্যা চাচা ভালোমতোই ঘাবড়ে যায়। দিনকাল খারাপ, কোনো গুলি-খাওয়া আহত মুক্তি কি তবে এখানে এসে মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করেছে ? হতেও পারে, যে দিনকাল পড়েছে ... যদি তাই হয় তবে কোথায় সে? বিরাট নিঝঝুম ধানক্ষেতে মইন্যা চাচা ভয়ে ভয়ে চোখ বুলালে হঠাৎ করেই ধানক্ষেতের এক কোণায় সাদাটে সোনালি কিছু-একটা চোখে পড়ে তার। নুয়ে-পড়া ধানগাছগুলো একটু সোজা করতেই দেখা যায় বড়শির টোপ গিলে পড়ে আছে একটা মানুষ-সমান লম্বা দেশী বোয়াল। বোয়ালমাছ। বাঁশের মধ্যে বেঁধে দুইজন কামলার কাঁধে ঝুলিয়ে তারপর সেই মাছ বাড়িতে আনা হয়েছিল। দা-কুড়াল দিয়ে বহু কষ্টে কাটা হয়েছিল মাছটা, কিন্তু মুশকিল হল কেউ সেই মাছ মুখে দিতে পারে না, বলে, মরা মানুষের গন্ধ লাগে। মইন্যা চাচা তরকারির মধ্যে বেশি করে তেল, আদা জিরা আর সুগন্ধী মশলা দিয়ে মরা মানুষের গন্ধ ঢাকার চেষ্টা করে, কিন্তু কিছুতেই সেই গন্ধ দূর হয় না, আর ওই সময় তো ফ্রিজও ছিল না, পুরো মাছটাই তখন ফেলনা হয়ে গেল ...

আর ক্যাম্পের ভেতরে এক শীতের সকালে আমার রায় ঘোষণা হয়ে গেল। এক পাঞ্জাবি অফিসার কাকে যেন শীতল কণ্ঠে অর্ডার দিয়ে গেল, 'শামকো উসে খতম কর দো'।

আমি সেই ভয়াল মৃত্যুময় শাম আসার জন্য অপেক্ষা করি আর যে আমার পাহারায় ছিল সেই বেলুচ সোলজার অবিশ্বাসী সুরে আমাকে জিজ্ঞেস করে,

'তুম্ মুসলমান হ্যায়? তুমহারা মুল্কমে সব তো হিন্দু হো গিয়া, তুম ক্যায়সে মুসলমান রহো ?'

আসর বা মাগরেবের সময় দূরের গ্রামের কোনো মসজিদ থেকে ক্ষীণ কণ্ঠে ভেসে-আসা আজান শুনে সেই বেলুচ সোলজার খুব অবাক হত, বলত, 'হিন্দু মুলকমে আজান কিউ শোনা যাতা হে? কিসনে আজান দিতা .... '

'তুমি ওই ক্যাম্প থেকে কিভাবে ছাড়া পেয়েছিলে দাদু?'

'কিভাবে ছাড়া পেয়েছিলাম কিংবা আদৌ ছাড়া পেয়েছি কি-না, তাই তো বুঝতে পারি নারে ভাই, এখনো তো মনে হচ্ছে একটা ঠাণ্ডা ভেজা স্যাঁতস্যাঁতে মাটির গর্তে ততোধিক স্যাঁতস্যাতে ঠাণ্ডা ভয় নিয়ে মাথা নিচু করে উবু হয়ে বসে আছি । এটা কি মাটির গর্ত নাকি মাটি খুঁড়ে তৈরি-করা বাঙ্কার। শুনতে পাচ্ছ, দূরে কোথায় যেন থেমে থেমে গুলির আওয়াজ হচ্ছে। এরপর কী যে হবে আন্দাজও করতে পারছি না, কাল রাতে ওরা আমাকে বাড়ি থেকে ধরে এনেছে .....'

বুড়ো মানুষটা লম্বা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বহুবার বলা গল্প আবার বলতে শুরু করে।

রা শি দা সু ল তা না

....

পরালালনীল

কয়দিন আগের একটা কথা মনে পড়লে এখনো হাসি পায়। লোকটা দেশের প্রধানমন্ত্রীর পুত্রের ঘনিষ্ঠ এক বন্ধু বলে নিজের পরিচয় দেয়। অসীম ক্ষমতাধর বলে পরিচিত সে। বনানীতে আমার বাসার ড্রইংরুমে এসে বসে। জিজ্ঞাসা করি, কোন মেয়েকে তার লাগবে; পুরনোদের মধ্যে কেউ, নাকি নতুন মেয়েদের দেখাব।

জবাব দেয়, "না আপনার সাথে গল্প করব।"

আমি বলি, "শুধু তা কেন, বসেন, গল্প করেন, তারপর চমৎকার অল্পবয়সী কোনো মেয়েকে দেই। দুর্দান্ত কিছু মেয়ে এসেছে।"

মুচকি হাসে। "অনেকের কাছে তোমার গল্প শুনেছি। প্রায় সবাই বলেছে তুমি নিজেও খুবই আকর্ষণীয়। ইউ উইল গেট ইনাফ পেমেন্ট, লট মোর দ্যান ইউ'ড এক্সপেক্ট।"

তাকে আমি বোঝাতে চেষ্টা করি, "দ্যাখেন, এই জায়গাটা এখন আমিই চালাই, কিন্তু নিজে আর পয়সার জন্য শুই না।"

“তুমি জানো, আমি না চাইলে বাংলাদেশের কোথাও তুমি এই ব্যবসা চালাতে পারবা না?”

নীরবে আমি তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি। শান্তভাবে তাকে বলি, “আপনি যত ধনী বা ক্ষমতাধর মানুষই হোন না কেন, আমি পয়সার জন্য শুই না আর কারো সাথে।”

লোকটা বিড়ালের মতো থাবা গুটিয়ে খানিকক্ষণ নীরব থাকে, যেন এক্ষুনি ঘুমিয়ে পড়বে। ঘরের চারপাশে চোখ ঘুরিয়ে জানালার পর্দা, পর্দা ছুঁয়ে আসা শেষ বিকেলের রোদের ফালি, টেলিভিশন, রিমোট কন্টোল, পেইন্টিং দ্যাখে। তারপর উঠে গিয়ে রুমের দরজা বন্ধ করে দেয়। আমি বলি, “কোনো লাভ নাই, আমাকে জোর করে রেপ করলে আমি প্রেস কনফারেন্স করব, তখন আপনার পলিটিক্যাল পার্টি আপনাকে উদ্ধার করবে না। আপনি জানেন আমি প্রস্টিটিউট, লাজশরমের বালাই আমার নাই।”

আমার মুখের দিকে লোকটা তাকিয়ে থাকে। তারপর প্যান্ট খুলে তার সুবিশাল পুরুষাঙ্গ তুলে ধরে বলে, “বাপের জন্মে দেখছ এরকম? জীবনে তো কম মানুষের সাথে শোও নাই। এমন জিনিস দেখছ আর?”

মনে মনে বলি, দাঁড়াও, তোমার ফুটানি ছুটাই। তার সামনে থেকে সরে গিয়ে দরজা খুলে দিয়ে বলি, “এই মুহূর্তে এখান থেকে চলে যান, নাইলে ড্রাইভার, দারোয়ান ডাকব।” সে ঠিকমতো প্যান্ট টান দিয়ে পরে হিস্‌হিস্‌ করতে করতে বেরিয়ে যায়। বলে যায়, “খানকি, তোমার দৌড় কতখানি আমি দেইখা নিব।”

সে বেরিয়ে গেলে আমার বেডরুমে ঢুকে একটা বালিশ আর ওয়ারড্রোব থেকে একটা চাদর বের করে এনে ছাদে চলে যাই। আকাশ-ভর্তি তারা দেখি। নারকেল পাতা সর্‌সর্‌ করে কাঁপছে। টবের হাস্নাহেনা ফুলের গন্ধ পুরো ছাদের বাতাসকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, আমার বন্ধু (ইশতিয়াক) হাসানকে ফোন করি। সব খুলে বলে জিজ্ঞাসা করি আরিফ নামে প্রাইম মিনিস্টারের ছেলের কোনো ঘনিষ্ঠ বন্ধু আছে কিনা। হাসান জানায়, সে চামচা জাতীয় কেউ, অত ঘনিষ্ঠ বন্ধু না। তেমন কাছের কেউ হলে সে জানত। “তবে আমাদের অফিসে এসে প্রাইম মিনিস্টারের ছেলের বন্ধু পরিচয় দিয়ে ক্ষমতা দেখায়। বিভিন্ন অফিসারের পোস্টিং করায়, বহু সিনিয়র অফিসার, এমনকি টপ লেভেল-এর অফিসাররাও তাকে তেল মারে। তোমার ওরিড হওয়ার কিছু নাই। তোমার কানেকশন অনেক স্ট্রং তা সে হয়তো জানে।”

তার ভাবনা অচিরেই মাথা থেকে অপসৃত হয়ে যায়। আজকে সন্ধ্যায় কবিতা লিখব ভাবছিলাম, এখন আর মুড নেই। বিকালে একটা কবিতা খানিকটা লিখেছি:

সন্ধ্যা অপেক্ষায় থাকে আমার জন্য
আমিও তার
বারান্দায় দেখি সোনালি পড়ন্ত সূর্য

দিগন্তের কাছাকাছি
ঝিলিমিলি রোদ ঝলসে দেয় নদী
নদীর বুকে একটুখানি আকাশ

নক্ষত্রময় রাতের স্নিগ্ধ আলো-অন্ধকার, হাস্নাহেনার গন্ধ, মৃদু বাতাসের আদরের ছোঁয়া আমাকে সজীব করে তোলে। কখন ঘুমিয়ে পড়ি টের পাই না।

পারতপক্ষে শহরে বের হই না আমি। রাস্তার জ্যাম, এত মানুষজন, হৈচৈ, দমবন্ধ লাগে। রাজন, ফাহিম, হাসান কয়জন ঘনিষ্ঠ বন্ধু আছে। মাঝে মাঝে ওদের কারো সাথে রেস্টুরেন্টে খেতে যাই। আরেকজন সচিব বন্ধু আছে হাসনাত আলী মাহমুদ, তিনি আমার এখানে পঁচিশ বছর বয়সী পিয়া নামের একটা মেয়ের সঙ্গ পছন্দ করেন। যাবার সময় আমার সাথে কিছুসময় আড্ডা মেরে যান। একদিন সোফায় পাশে বসে কথা বলতে বলতে আমার গাল টিপে দিয়েছিলেন।

তিনি চেষ্টা করেন ফ্লার্ট করতে।

"কত যে আভায় ঝিকমিক করে নক্ষত্রের মতো তোমার দু'চোখ।"

আমি হাসি। জানালার পর্দা টেনে দিতে উঠে যাই। ফিরে এসে অন্য সোফায় বসি। সচিব সাহেব বলেন, "তোমার সাথে গল্প করাও ইন্টারেস্টিং, এই রকম একটা প্রফেশনে এত সফিস্টিকেশন, এত পড়াশোনা-জানা কেউ!"

সন্ধ্যার দিকে রাজন ফোন করে, "কেমন আছো, বেবি? চলো, ঢাকার বাইরে যাই, বৃহস্পতিবার হাফ-অফিস করে তোমার বাসায় চলে আসব। তারপর গাজীপুরে তোমার বাগানবাড়িতে চলে যাব। তবে রাত এগারোটার মধ্যে আমার ঢাকায় ফিরতে হবে। বউ ইদানীং কড়াকড়ি আইনের মধ্যে রাখছে।"

রাজনের সাথে পরিচয় হয় পাঁচ বছর আগে। তখন বনানীর এক বাসায়, উচ্চবিত্ত এলাকার আর-দশজন সাধারণ বারবনিতারই একজন ছিলাম। ঐ সময়টায় ভীষণ প্রেমে ডুবে ছিলাম শিহাবের। প্রথম যেদিন রাজনের সাথে পরিচয়, সে একসময় বলে, "তোমাকে প্রথম দেখার সময়েই মুগ্ধতা তৈরি হইছিল আমার, যতক্ষণ আমার পাশে ছিলা, মনে হইছিল একবিন্দু মনোযোগ তোমার নাই আমার প্রতি। তোমার চোখের দিকে তাকালেই মনে হয় তুমি অন্য কোনো গভীর ভাবনায় ডুইবা আছো।"

আমি ভয়ে-ভয়ে সদ্য-পরিচিত লোকটার দিকে তাকাই। বলি, "আসলে আমার শরীরটা ভালো নাই। তাছাড়া এখানকার ম্যানেজার দুপুরে ঝগড়া করছে আমার সাথে, এজন্যও মন খারাপ।" তারপর বলি, "আমি আপনার সাথে কোঅপারেটিভ ছিলাম না ম্যাডামকে জানায়েন না, প্লিজ।" বলতে-বলতে কেঁদে ফেলি। যদি আমার সম্পর্কে কেউ এই গেস্টহাউসের ম্যানেজারকে কিছু বলে দেয়, আমাকে হয়তো বের করে দেবে এখান থেকে। নারায়ণগঞ্জে বা অন্য কোথাও চলে যেতে হবে। আমার একমাত্র

মেয়েকে দার্জিলিং-এ একটা কনভেন্ট স্কুলে পড়াই। তখনও বাড়িগাড়ির মালিক হইনি। মেয়ের খরচ কে জোগাবে। রাজনকে খুলে বলতে পারি না যে একজনকে পাগলের মতো ভালোবাসি। আমার মন প্রাণ যকৃৎ হৃৎপিণ্ড - সব তারই জন্য। রাজন আমার কপালে, দু'চোখে চুমু খেয়ে বলে, "আমি তোমার কাছে আবার আসব। তুমি অনেক মিষ্টি।" সেই থেকে রাজনের সাথে বন্ধুত্ব, তারপর থেকে আমার যে-কোনো বিপদে, অস্থিরতায় সে আমার পাশে ছিল।

আমার এখানকার মেয়েগুলো প্রায় সবাই দেখতে-শুনতে খুব ভালো। এরা সবাই তাদের পেশাকে ভালোবাসে। নিজেদের স্বাধীন মনে করে। সকালবেলায় ঘুমায়। দুপুরে পেডিকিওর, ম্যানিকিওর, বিউটি পারলার, বা ঘরদোর গোছাতে ব্যস্ত থাকে। কেউ ইংরেজি শেখে। পুলিশ, আমলা, রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী, বিত্তশালী বহু নামি-দামি লোকজন আসে ওদের কাছে। প্রায় সবসময়ই তারা নিজেদেরকে ফুলদানির ফুলের মতো সাজিয়ে রাখে। অবসরে সিনেমা দ্যাখে বা ঘরদোর, ফুলের টবের যত্ন নেয়। অনেকেই মাসে-মাসে ঢাকায় বা গ্রামে বাবা-মাকে টাকা পাঠায়।

রাতে ঘুমানোর আগে যুক্তরাজ্যের কার্ডিফ বিশ্ববিদ্যালয়ে-পড়া আমার একমাত্র মেয়ে লিরাকে ফোন করি। ফোনে মেয়েটা বাচ্চার মতো সারাদিনের সব ফিরিস্তি দেয়। শৈশবে-কৈশোরে তাকে বুঝতে দেইনি আমার পেশা কী।

রাতে প্রায় একঘণ্টা হাল্কা মিউজিক ছেড়ে ৩৭ ডিগ্রি গরম জলে বাথটাবে গোসল করি। গোসল-শেষে এত সজীব লাগে মনে হয় ভেসে বেড়াব এখন। 'মন মোর মেঘের সঙ্গী...' গাইতে-গাইতে বিছানা চাদর বালিশ নিয়ে ছাদে চলে যাই। আকাশে হালকা মেঘ চাঁদকে ঢেকে দিচ্ছে, চাঁদের চারপাশে মেঘের বিমূর্ত পেইন্টিং। মাঝেমাঝেই আমার মনে হয়, আমার মতো সুখী মানুষ পৃথিবীতে খুব বেশি নেই। একটা ছোট্ট ঘাসফুলের সৌন্দর্যও প্রাণ ভরে পান করি আমি।

রাস্তার ট্রাফিক, শপিং মল, এয়ারপোর্ট রোডের দু'পাশের সবুজ গাছ, রংবেরং-এর ফুল এবং গাড়ির সঙ্গীতে ঢাকা ছেড়ে গাজীপুরে পৌঁছাই। পুরো পথ আমার থেকে খানিক দূরত্ব বজায় রেখে রাজন অভিনিবেশে গান শুনছিল অথবা হয়তো কিছু ভাবছিল। গাড়িতে ড্রাইভারের সামনে সে সবসময় আমার থেকে দূরত্ব বজায় রাখে।

এক বয়স্য বন্ধু জাফরানের কাছ থেকে গাজীপুরের এই বাগানবাড়িটা পেয়েছি। প্রথম সাক্ষাতে সত্তর বছর বয়সী জাফরান আমার পাশে এসে বসে। সৌহার্দ্য বিনিময়ের পর প্রায় আর কোনো কথাই হয় না দু'জনের মধ্যে। তার গম্ভীর মুখশ্রীর সামনে নিজে থেকে কোনো কথা বলতেও সংকোচ হয় আমার। কিছুক্ষণ নীরবে ড্রিংক

করে আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল সে। বলল আরেকদিন আসবে। তার পোশাক, জুতা সবকিছু থেকে অভিজাত্য ঠিকরে পড়ত। মুখে সবসময় এক বিষণ্ণ গাম্ভীর্য ঝুলে থাকত তার। আমার কাছে দাবিও ছিল খুবই সামান্য। আমাকে অনুরোধ করত নগ্ন শুয়ে থাকতে। সবসময় যে আমার দিকে তাকিয়ে থাকত, তা-ও না। বিছানায় আমাকে নগ্ন হয়ে রেখে পাশে সোফায় বসে মদ খেত। মদ খেতে খেতে নিজস্ব কোনো ভাবনায় ডুবে যেত সত্তরোর্ধ্ব মানুষটা। অনেকসময়ই টেবিল-ল্যাম্পের মৃদু আলোতে, সঙ্গীতের মূর্ছনায় লোকটাকে পাশে বসিয়ে রেখেই ঘুমিয়ে পড়তাম। ভোররাতে নিজেকে আবিষ্কার করতাম তার বুকে আলিঙ্গনাবদ্ধ। আমাকে জাপটে সজোরে বুকে চেপে ধরা আর মাঝে মাঝে মাথায়, মুখে, শরীরে চুমু খাওয়া ছাড়া অন্য কোনো যৌন আচরণ সে করত না। কখনও এত জোরে চেপে ধরত যে মনে হত হাড়গোড় চুরমার হয়ে যাচ্ছে।

স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কখনও কখনও চেষ্টা করতাম তার ভিতরের পুরুষকে জাগিয়ে তুলতে, কোনো লাভ হত না। তার সন্তানেরা বিদেশে থাকে। স্ত্রী মারা গেছে প্রায় বিশ বছর। তার শক্ত সজোর আলিঙ্গনে টের পেতাম সব নিঃসঙ্গতা সে পুষিয়ে নিতে চায় আমাকে সর্বশক্তি দিয়ে বুকে চেপে ধরে। যে গেস্টহাউসে থাকতাম তার ম্যানেজার লাবণী ম্যাডামের অনুমতি নিয়ে আমাকে সে নিয়ে যায় গাজীপুরে তার বাগানবাড়িতে।

বন, দিঘি, বাগান, ধানখেত, মাঠ– সুবিশাল এলাকা জুড়ে রাজপ্রাসাদের মতো তার বাগানবাড়ি। উঠানের পাশে পাতাবাহার গাছ দিয়ে ঘেরা দারুণ দৃষ্টিনন্দন এক ফুলের বাগান। পৃথিবীর সব সৌন্দর্য যেন সেখানে স্থির হয়ে আছে। জাফরান বলে, "চলো, বাড়ির ভিতরে চলো, তারপর পুরো বাড়ি ঘুরে দ্যাখো।" বাড়ির ভিতরটা অভিজাত। হাত মুখ ধুয়ে শাড়ি বদলে সালোয়ার কামিজ পরে আমি বেড়াতে বের হই। জাফরান পইপই করে বলে দিলেও, বাড়ির কেয়ারটেকার রহমতকে সাথে নেই না। একাই বেরিয়ে যাই। দু'পাশে শালবন, তার মাঝে সরু একটা হাঁটাপথ, বনের উপরে মেঘযুক্ত একচিলতে নীলাকাশ। মার্চ মাসের বিকেলে হালকা বাতাসে শালগাছ ছাড়াও নানা লতা আর হাজারো বুনো গাছ মাথা নেড়ে আনুগত্য জানাচ্ছে। একটা ছোট ঝোপ আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা আছে মাকড়শার জালে। গলা ছেড়ে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাই, 'এই উদাসী হাওয়ার পথে পথে মুকুলগুলি ঝরে..।' মাটিতে মরা গাছের গুঁড়িতে সবুজ মখমলের মতো শৈবাল তার সাম্রাজ্য বিস্তার করছে। ঝিরিঝিরি হাওয়া, পাখির সঙ্গীতে অতীত, ভবিষ্যৎ, অর্জন, বিসর্জন সবকিছু বিস্মৃত হয়ে যাই। এই অরণ্য, পাখির গান– যেন এই সবকিছুরই অংশ আমি। মেয়ে ছোট থাকতে যখন ওর কাছে যেতাম দার্জিলিং, তখনও মা-মেয়ে ঘন কুয়াশার মতো মেঘরাজ্যে হারিয়ে যেতাম। আমি আর লিরা প্রজাপতির মতো পাহাড়ে জঙ্গলে সারাদিন দাবড়ে বেড়াতাম।

ঘন অরণ্যের ভিতর এই একচিলতে পথে শুকনো পাতা মাড়িয়ে কিছুদূর এগিয়ে গেলে একটা ছোট খোলা মাঠ, তাতে উঁচু ঘাস, পাশেই বড় একটা দিঘি। চারপাশের মানুষের সাড়া পাওয়া যায় না, শুধুই বাতাসের গোঙানি। মাটি-কামড়ে-থাকা কিছু লতানো গাছে ছোট-ছোট হলুদ ফুল ফুটে আছে। হাওয়া তার নরম আদর বুলিয়ে খেলছে আমার চুলে, চোখের পাতায়, গালে, ওড়নায়। চারিদিকে পাতার মর্মর, পাখির কিচিরমিচির, কাকের কাঁপা-কাঁপা ডাক। প্রকৃতির এই সুরেলা সমাবেশে আমি মাতাল হয়ে যাই। বাগানবাড়ির মালিক, আমার বন্ধু জাফরানের প্রতি কৃতজ্ঞতায় মন ভরে ওঠে।

একটা মাছরাঙা দিঘির জলের উপর দিয়ে উড়ে চলে গেল বনের দিকে। মাঠের মাঝে সরু হাঁটাপথ পার হয়ে দিঘির শান-বাঁধানো ঘাটে নামি। বেশকতক সিঁড়ি নেমে গেছে জলে। বাচ্চাদের মতো লাফিয়ে-লাফিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নামি। হাঁটুঅব্দি দুই পা জলে ডুবিয়ে বসে থাকি। একটা আমগাছ তার শরীরের বেশির ভাগই পুকুরের পানিতে ঝুঁকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পুকুরের ওপাশে ঘন বন তার অতল রহস্যের ভাণ্ডার নিয়ে স্থির। বরফের চাঁইয়ের মতো সাদা মেঘ পুকুরের জলে প্রতিফলিত হয়ে বাতাসে-ওঠা ছোট-ছোট ঢেউয়ে ভেঙে-ভেঙে যাচ্ছে। আমার পায়ের কাছে ডোবানো সিঁড়িতে ছোট-ছোট মাছের ঝাঁক। পাশে নানান জলজ উদ্ভিদের ফাঁকে ফাঁকে বড় কিছু মাছ কানকো নেড়ে নেচে যাচ্ছে। জল-ডোবা দু'পায়ে জলের নীচে সিঁড়িতে তাল দিয়ে গান গাই, 'মোর বীণা ওঠে কোন সুরে বাজি।' মাছগুলো আমার পায়ের কাছ থেকে সরে সরে যায়।

সন্ধ্যা নেমে এলে ফিরে আসি। খুব ধীরে আঁধার নামবার সময়ের প্রতিটা পরিবর্তন, প্রতিটা পল উপভোগ করি আমার সংবেদনে। ঘরে ফেরার পর আমার বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস দেখে জাফরান হাসে। ঘরের সব আলো নিভিয়ে, মোমবাতির আলোয় রাতের খাবার খেতে খেতে ছোট শিশুর মতো আবদার করি, "আরো কিছুদিন এখানে থাকব।" রাতে জাফরান যেমন সজোরে জড়িয়ে ধরে আমাকে ঘুমায়, আমিও আষ্টেপৃষ্ঠে তাকে আঁকড়ে থাকি ঘুমে নেতিয়ে না-পড়া পর্যন্ত। সেবার টানা তিনদিন ঐ বাগানবাড়িতে থাকি। বনে আর দিঘির পাড়েই কাটে দিনের বেশিরভাগ।

সন্ধ্যার পর থেকে চারপাশে ঝিঁঝিঁপোকার শব্দে, মোমবাতি বা টেবিল-ল্যাম্পের আলোয় আমরা দু'জন গান শুনি। রাতে ছাদে চলে যাই, হয়তো রবীন্দ্রসঙ্গীত গাই, সে নীরবে শোনে। তাকে মাঝেমধ্যে অন্য গ্রহের কোনো মানুষ মনে হত। মনে হত দু'চোখে রাজ্যের বিস্ময় নিয়ে আমার কাণ্ডকারখানা উপভোগ করছে সে।

যদিও টাকার জন্য করতাম, তারপরও শুরুর দিকে জাফরানের সামনে নগ্ন হতে গ্লানি বোধ হত। মনে হত পয়সার জন্য এত বৃদ্ধ এক লোকের সাথে শুচ্ছি। তাছাড়া বয়সের কারণে তার মুখ থেকে গন্ধও বের হত। অথচ জাফরানই আমার জীবনটা

বদলে দিল। শুরুর দিকে তার বাগানবাড়ির চাবিটা সে আমাকে দিয়ে দেয়। পরে বারিধারায় একটা অ্যাপার্টমেন্ট। এবং তার সহায়তায়ই একজন সাধারণ বারবনিতা থেকে একজন পুরোদস্তুর ব্যবসায়ী হয়ে উঠতে পারি। যেহেতু দালাল, কাস্টমার, পুলিশ, প্রশাসন, রাজনীতিবিদ, সবারই সাথে কানেকশন তৈরি হয়ে গেছিল, ব্যবসাটা বুঝে উঠতে আমার সময় লাগেনি। আমার ব্যবসা বেশ্যাদের নিয়ে হলেও, নিজে আর পয়সার জন্য শুই না। গত চার বছর আগে জাফরানকে তার সন্তানেরা আমেরিকা নিয়ে যায়। ওখানে তার মেরুদণ্ডের নার্ভের অপারেশন হয়। বহুদিন ব্যথায় ভুগছিল। অপারেশনের পর নাকি সে প্যারালাইজড হয়ে যায়। গত বছর মারা গেছে আমেরিকাতেই।

কেউ-কেউ আমার প্রেমে পড়ে নানারকম অদ্ভুত কাণ্ড করত। একবার এক ব্যবসায়ী আমার প্রেমে পড়ে। সে কী অনুনয়, আমি যেন তাকে বিয়ে করি; তার সবকিছু সে আমাকে দিয়ে দিবে। সুপুরুষ, শিক্ষিত, সফল ব্যবসায়ী লোকটা ছেলেমানুষের মতো আচরণ করে; আমার দু'হাত ধরে করুণ চোখে আমার মুখে তাকিয়ে থেকে দীর্ঘ সময় পার করে দেয়। কী আকুতি তার দু'চোখে! আমাকে বোঝায়, তাকে বিয়ে করলে সম্মানজনক একটা জীবন হবে আমার। মনে মনে হাসি, নিজের স্বাধীনতা ছেড়ে সম্মানজনক জীবনের প্রয়োজন আমার নেই। অন্তত আমার।

আমি আমার স্বাধীনতা ছাড়তে রাজি হইনি। শেষের দিকে এমনকি দেখাও দিতাম না তাকে। একদিন আমাকে ফোন করে সে কী কান্না- "তোকে আমার সন্তানের মতো ভালোবাসি, আর তুই একবারের জন্য আমার ফিলিংসটা বুঝলি না!" তার সাথে যদিও শীতল আর কঠোর ব্যবহার করি, কিন্তু মনে মনে ভয় পাই আত্মহত্যাটত্যা করে বসে কিনা। আমার এক বেশ্যা বান্ধবী রীতার সাথে প্রণয় ছিল পুলিশের একজন দারোগার। তার প্রেমিকা তাকে এড়িয়ে চলতে শুরু করলে লোকটা একসময় আত্মহত্যা করে। ঐ ঘটনাটা আমাদের ম্যানেজারসহ এখানকার সবগুলো মেয়েকে বিষণ্ণ করে দিয়েছিল। মারা যাওয়ার আগের রাতে সে রীতার সাথে দেখা করতে তার রুমের সামনে ছুটে গিয়েছিল। রীতা তার মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দেয়। আমাদের ম্যানেজার ডেইজি ম্যাডামও রীতাকে অনুরোধ করে লোকটার সাথে দেখা করতে, তা না হলে অন্তত কথা বলতে। সে তা-ও বলেনি। সেই রাতেই লোকটা নিজের মাথায় গুলি করে।

বছর চারেক আগে আমি শিহাবের প্রেমে পড়ি। অল্পসময়ের মধ্যেই আপাদমস্তক ডুবে যাই। একদিন সে বলে, "তোমার কথা বলার ভঙ্গি, ভ্রু-কোঁচকানো, চাউনি, চুলের স্টাইল, হাঁটার ভঙ্গি, সবকিছু মিলিয়ে তুমি এক সম্রাজ্ঞী। অন্তত একটা রাজপ্রাসাদ তোমার থাকা দরকার। তুমি সেখানে বাগান চাইলে বাগান করে দিতে হবে। চুল আঁচড়াতে চাইলে চুল আঁচড়ে দিতে হবে। তোমার ঘরে ঢোকার আগে,

তোমাকে ছোঁবার আগে, মাথা নুইয়ে বাও করতে হবে, মহারানি।" আমি বলি, "তুমি আমার কানে এত মধু ঢেলে দাও!" সে বলে, "মধু আবার কড়ায়-গণ্ডায় ফেরত নিব তোমার প্রতিটি ইঞ্চি থেকে।"

সে ছিল রাজনীতিবিদ, সরকারি দলের এমপি। বুদ্ধিমান, সহজ আর বন্ধুবৎসল। শিহাবের সাথে সাথে সম্পর্কের আনন্দটা এই ছিল যে সে আমাকে তার সমান উচ্চতায় তুলেই সম্পর্ক রেখেছে। প্রথম থেকেই তাকে ভালো লাগে আমার। শিশুর মতো তার হাসি দেখে ভাবতাম একজন রাজনীতিকের হাসি এত অনাবিল হয় কেমন করে! ব্যক্তিত্ব, প্রজ্ঞা, কৌতুকপ্রিয়তা, আমার সমস্ত দিয়ে চেষ্টা করেছি তাকে টানতে। সে-ও তার চরম ব্যস্ততার মধ্যেও দিন-রাত যখনই অবসর পায় ফোন করে বা চমৎকার এসএমএস পাঠায়...

Your hair, my favorite touch
Your eyes, my favorite sight
Your cheeks, my favorite color
Your ears, my favorite whisper
Your lips, my favorite kiss
Your voice, my favorite symphony
Your smile, my favorite aim
Your presence, my favorite hope
Your touch, my hottest feeling

একবার সে আমেরিকা যায় কনফারেন্স যোগ দিতে, তার আগেরদিন দুপুরবেলাটা আমার সাথে কাটিয়ে যায়। আমেরিকাতে তাকে এসএমএস পাঠাই, "I still smell you in my room." সে জবাব দেয়, "I am never too far." সেবার প্রায় পনেরো দিন সে আমেরিকাতে থাকে।

আবার মেসেজ আসে, "I don't know why I am so lonely, especially at dawn. I miss so much being at your place, watching you sleep. Oh, how I wish I could wake up beside you every morning of my life!" আমি লিখি, "My life, my destiny, is in your hand. You can do with me whatever you will. I will never let you down."

মাঝে মাঝে এমন হত যে মিটিং থাকলে বা নিজের নির্বাচনী এলাকায় গেলে হয়তো সে ফোন ধরত না। আর এদিকে আমি সারাদিন ফোন করেই যেতাম । রাত ১২টার পরে হয়তো পেতাম তাকে, আর তখন তটভূমিতে আছড়ে-পড়া সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের মতো কান্নায় আমার গলা জড়িয়ে যেত- "আর কিছুক্ষণ তুমি কথা না বললে আমি আত্মহত্যা করতাম!" কান্না থামার পর আবার শিশুর মতো আহ্লাদ করতাম, ভুলে যেতাম আমার ৪৫ চলছে। বা হয়তো তুমুল চেঁচামেচি বাঁধাতাম, "তোমার ব্যস্ততা বোঝার দরকার আমার নাই। লাঞ্চ টাইমে বা অন্য কোনো সময় কি একটু ফাঁক বের

করে ফোন করতে পারতা না?” বলেই হয়তো ফোন কেটে দিতাম। আবার তিন/চার মিনিটের মাথায় ফোন করে ফোঁপাতাম- “তোমার সাথে ঝগড়া করে তো দুই মিনিটও থাকতে পারি না।”

নিজেরই বিস্ময় লাগত আমার মতো শত-পোড়-খাওয়া মাঝবয়সি এক প্রফেশনাল হোর কেমন বাচ্চাদের মতো করছি!

কিছুকালের মধ্যেই তার সাথে আমার এক অদ্ভুত টেলিপ্যাথিক যোগাযোগ শুরু হয়। রান্না করতে করতে হঠাৎ হয়তো মনে হচ্ছে কোনো টিভি চ্যানেলে তাকে দেখা যাচ্ছে। টিভি অন করে দেখি ঠিকই টক শো দেখাচ্ছে, অথচ এর খবর আমাকে কেউ দেয় নি। আবার কোনোদিন সারাদিন হয়তো ফোন করেনি। রাত ১১টার দিকে মনে হয়েছে কিছুক্ষণের মধ্যেই সে ফোন করবে। ঠিক তার দশ-পনেরো মিনিটের মাথায়ই তার ফোন। একবার ভারতীয় এক সংগীতশিল্পীর অনুষ্ঠান দেখতে গেছি জাদুঘর মিলনায়তনে আমার বাসার সব মেয়েরাসহ। ওখানে পৌঁছেই মনে হয়েছে সে আছে। অনুষ্ঠান-শেষে দেখি সে বেরিয়ে যাচ্ছে সাথে আরও দু'তিনজন লোকসহ। আমাকে দেখে সঙ্গীদের কাছ থেকে একটু দূরে সরে এসে বলে, “তুমি এইখানে!” আমি বলি, “আমার টেলিপ্যাথিক ক্ষমতা তৈরি হইছে, আজকে এখানে আসার পর থেকে আমার মন বলতেছিল তুমি এখানেই আছো, অথচ গতকালই বলছিলা আজকে সারাদিন ব্যস্ত থাকবা।”

“পাগলদের টেলিপ্যাথিক ক্ষমতা থাকে,” হেসে জবাব দেয়। “লোকজন অপেক্ষা করতেছে আমার জন্য, পরে কথা বলব।”

আরেকদিন ঈদ-এর কয়েকদিন আগে গুলশান আড়ং-এ যাই। ওখানেও ঢোকার পর থেকেই আমার মন বলছিল, সে আছে এখানেই ভিড়ের মাঝে। পাঞ্জাবি সেকশনের দিকে যেতে দেখি, এক ভদ্রমহিলা তাকে পাঞ্জাবি দেখাচ্ছে। আমি তার কাছে যেতেই চোখের ইশারায় বোঝায় পাশে তার স্ত্রী।

আমার সাথে যা একেবারেই যায় না সে কথাটা তাকে বলি একদিন। যদিও আমি আমার ব্যবসায় পুরাপুরি সেটেলড। তারপরও বলি, “শোনো, তুমি যেভাবে চাও আমি তেমনই হব। তুমি যদি চাও এই বিজনেস ছেড়ে দিব। স্কুলে মাস্টারি করব। আর বাসাভাড়া যা আসে তাতেই চলে যাবে। লিরাকে বলব সপ্তায় ২/৩ দিন অড জব যেন করে। তা নাহলে আমার বাগানবাড়িটা বিক্রি করে দিব। একসময় তো অনেক গরিবের মেয়ে ছিলাম। নতুন পরিস্থিতিতে অ্যাডজাস্ট করতে আমার সমস্যা হবে না।”

সে বলে, “তুমি এই ব্যবসা করো জেনেই তো প্রেমে পড়ছি। তোমার সাথে মিশে দেখছি এমন আর হয় না। আমার জন্য এমন কোনো সিদ্ধান্ত নিয়ো না যার জন্য দু'দিন পর অনুতাপ করবা। তোমার প্রফেশনের প্রতি কোনো অশ্রদ্ধা নাই আমার। আমরা পলিটিশিয়ানরা তো কত অন্যায় করি, মানুষের সাথে কত প্রতারণা করি।

তুমি যা-ই হও না কেন, সবসময়ই আমার মহারানি।"

একদিন তার বুকে মুখ ঘষতে ঘষতে বলি, "শোনো, কোনো-না-কোনো সময় তো তুমি বোরও ফিল করতে পারো, তখন কি আমাকে ছেড়ে চলে যাবে?"

"যে আমাকে ফেলে দেয় না তার সাথে আমি থাকি। সারাজীবনই থাকি। তাছাড়া তোমার ব্যক্তিত্বের এবং শরীরের আকর্ষণ দু'টোই আমার কাছে তীব্র। আমি এই পাগল মেয়েটাকে হারাতে চাই না, কখনও না। তবে তোমার যদি বোরিং লাগে তবু আমারে ধরে থাইকো। আমারই থাইকো। তোমার গলা শুকনা লাগতেছে কেন?"

"সকালে কাঁদছিলাম। প্রেমে পড়লে মনে হয় মানুষের মাঝে মাঝে কান্না পায়।"

"লিপি, আমারও কান্না পায়। এই যে রাজনীতি করি, বক্তৃতা দেই। মাঝে মাঝেই মনে হয় অন্যের জীবন যাপন করতেছি। ভণ্ডামি করতেছি।"

আমার টেলিপ্যাথি, কার্যকারণ সব ব্যর্থ করে দিয়ে শিহাব হঠাৎ একদিন আমার সাথে সব যোগাযোগ বন্ধ করে দেয়। আমি ফোন করলে রিসিভ করে না। কোনো অচেনা নাম্বার থেকে ফোন করলেও আমার কণ্ঠস্বর শুনলেই লাইন কেটে দেয়।

প্রেমে ডুবে ছিলাম আমরা, আমার সাথে যোগাযোগহীনতার তিনদিন আগেও আমার জন্য একটা হীরার নাকফুল নিয়ে এসেছিল। নিজেই পরিয়ে দিয়েছিল। আমি বলেছিলাম, "মৃত্যুর পর আমার নাক থেকে লোকজন এটা খুলে নেবে। মৃত্যুর আগে কখনোই না।" আমার ঘোষণায় সে হেসেছিল। আমার সাথে যোগাযোগ বন্ধ করে দেওয়ার পর, টিভিতে টক-শোতে, সংসদে, আগের মতোই তাকে উজ্জ্বল দেখি। তখনও আমার নাকে তার দেওয়া নাকফুল, নাকের চারপাশ পুঁজে, ব্যথায়, ফুলে ঢোল, মগজময় চার বছরের প্রেমের স্মৃতির বুদবুদ। সেইসময় জীবনের সবচেয়ে বড় পাগলামিটা করলাম, প্রেস কনফারেন্স করলাম। সাংবাদিকদের জানালাম পতিতাবৃত্তি আমার পেশা। বিভিন্ন সময়ে মোবাইল ফোনে আমার তোলা তার ছবি দেখালাম; জানালাম চার বছর গভীর প্রেমের সম্পর্ক থাকার পর কীভাবে আমাকে সে ছুঁড়ে ফেলে দিল। কথা বলতে বলতে সাংবাদিকদের সামনে কেঁদে ফেলি আমি। ফলাও করে সব পত্রিকায়, প্রাইভেট টিভি চ্যানেলে প্রচারিত হয় এ-খবর।

তারপর কয়েকজন সাংবাদিক আমার পিছে ঘোরে, আমার প্রণয়-কাহিনী নিয়ে স্টোরি করবে। তাদের কাউকে-কাউকে টাকা দিয়ে নিবৃত্ত করি। এর পরও কয়েকটা পত্রিকা আমাকে নিয়ে কভার স্টোরি করে। আরও কিছু ব্যবসায়ী, রাজনীতিবিদ, আমলা আর পুলিসকে জড়িয়ে নানা গল্প বানায়, যাদের অনেকেরই সাথে আমার এমনকি পরিচয়ও হয় নি কোনোদিন। শিহাবকে বাদ দিয়ে আমিই হয়ে দাঁড়াই পত্রিকাগুলোর ফোকাস। এর পর পুলিশ আর গোয়েন্দারাও আমার খোঁজখবর শুরু

করে। আমার মেয়েগুলোকে, বা নানা কানেকশনকে ব্যবহার করে তাদেরও আস্তে-আস্তে থামাই আমি।

সেই সংকটে আমার বন্ধু রাজন এসে পাশে দাঁড়ায়। শিহাবের সাথে আমার সম্পর্কের আগে থেকেই রাজন আমার বন্ধু ছিল। শিহাবের সাথে প্রণয়কালে রাজনের সাথে যা গল্প করতাম তার বেশিরভাগই শিহাবকে নিয়ে। বছরখানেক আগে লন্ডন থেকে মেয়ে ফোন করে সে কী কান্না! তার সার্বিয়ান প্রেমিক তাকে ছেড়ে চলে গেছে। রাজনকে দায়িত্ব দেই লিরাকে বোঝাতে। একটা বাচ্চাকে বোঝ মানানোর মতো রাজন বহু সময় ধরে লিরাকে বোঝায়। পরে লেবানিজ এক ছেলের সাথে প্রেম হলে লিরা সামলে ওঠে।

শিহাবের সাথে যখন সম্পর্ক ছিল, পারতপক্ষে তখন সে ছাড়া অন্য কারো শয্যাসঙ্গী হইনি আমি। রাজনকে যে কত উচ্ছ্বাস দেখিয়েছি। শিহাব চলে গেলে রাজন ছাড়াও ফাহিম, ইশতিয়াকসহ আরও কিছু নতুন বন্ধু হয়।

রাজনসহ গাজীপুরে আমার বাড়িতে যখন পৌঁছাই, তখনই আমার মেয়ে ফোন করে। রাজন পাশে আছে শুনে লিরা তার সাথে কথা বলে। লিরার সাথে কথা বলার সময় তার মুখ একজন বাবার মতোই উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

আমার আরেক বন্ধু মুহিবের এসএমএস যখন আসে, রাজনের পাশে আমি শুয়ে। "I'm not in London, I'm away on a seminar, I'll write you a mail tomorrow afternoon when I'm back."

বাথরুমে যাওয়ার জন্য রাজন উঠে যায়।

রাত ৯টার দিকে রাজন চলে যায়। তারপর ছাদে যাই বালিশ, চাদর আর মাদুর নিয়ে। এক-আকাশ ঝিকিমিকি তারার নিচে ছাদের ওপর ঝুঁকে-পড়া একটা গাছে অগণিত জোনাকি জ্বলছে আর নিভছে। চারপাশে টানা ঝিঁঝিঁপোকার শব্দ, আর জোনাক-জ্বলা অপার্থিব সৌন্দর্যের মুখোমুখি হয়ে ভাবি, যে-আমি প্রকৃতির বিন্দুবিন্দু রসও শুষে নিতে জানি, তাকে কেন কখনোই কান্নাকাটি করতে হবে? ছাদে গান গাই:

Close your eyes and I'll be on my way.
One more time let me kiss you.
Now the time comes to leave you
Every song I sing, I sing for you
When I come back I'll bring your wedding ring
So kiss me and smile for me
Hold me like you never let me go.
I'm leaving on a jet plane
Don't know when I'll be back again.
Oh babe, I had to go.

পাশের বন থেকে খ্যাঁকশেয়ালের ডাকাডাকিতে অন্ধকার গাঢ় হয়। আকাশে মেঘ জমেছে, ছোপ-ছোপ মেঘ এসে তারাগুলোকে ঢেকে ফ্যালে। মাদুর আর বালিশ নিয়ে ঘরে ফিরে যাই। কবিতা লিখতে বসি, পুরনো ডায়েরি বের করি, কিছু টুকরো-টুকরো কবিতা আছে। সেগুলোর ওপর কাজ করতে হবে। শিহাবের সাথে যখন প্রেম, সেসময় থেকেই কবিতা লিখি-

সাদা বিড়াল

হুল্লা শুনে
এগিয়ে যেতে দেখি
একদল সাদা বিড়াল আকাশে
উড়ে যাচ্ছে, তার পিছে উড়ে যাচ্ছে
একটা রাজনৈতিক মিছিল, ঘর্মাক্ত
সমবেত বিড়ালেরা কাঁদছে
আকাশে প্রবল ধারাপাত

স্মৃতি

নিয়ে যাচ্ছে স্মৃতি ভাটির টানে, মেঘনা ব্রিজের
ওপর দিয়ে বিন্দুর মতো, খোসার মতো দুলে
যাত্রীবাহী নৌকা, স্মৃতি এক অবিরাম ঘূর্ণাবর্ত
পাক খেয়ে টলে
ঝিকিমিকি সূর্য-প্রহরায়
জমাটবদ্ধ হুইসেলের স্মৃতি নিয়ে
নদীতীরে জেলেবউ কাপড় শুকায়
ঘুমাতে ঘুমাতে যায় ভাটির টানে
নদী ট্রেন আর সে
যদি আরেকবার শুধু ছুঁতো আমায়

পরদিন বেলা করে ঘুম থেকে উঠি। মুখ ধুয়ে আয়নায় তাকিয়ে দেখি আমার নাকফুলের চারপাশ লাল হয়ে আছে। ফুলে উঠেছে। প্রায় বছরখানেক আগে শিহাব নাকফুলটা পরিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু আজও মাঝেমাঝেই নাকের চারপাশটা ফুলে ওঠে। পুঁজরক্ত বের হয়। ব্যথায় টনটনায়। ইনফেকশন থাকে কয়দিন। ডাক্তার অবস্থা দেখে বলেছিল নাকফুলটা খুলে ফেলতে। আমি রাজি হইনি। সুঁচ-রাজকুমারের মতো লাগে নিজেকে মাঝে মাঝে। শিহাবকে আবার গালি দেই , প্রতারক, আই হেইট ইউ!

ঘর থেকে বেরিয়ে বনে ঢুকি। সামনেই ছোট একটা গর্তে কালো পানি জমে আছে। সরু হাঁটাপথ পার হলেই ঘন ঘাসে-ভরা খোলা মাঠ। বনে ঢোকার পরই বিষণ্নতা উবে যায়। দিঘির ঘাটে গাছের ছায়ায় বসি। ভরদুপুরে একদল মশা আমার মাথার ওপর টানা গান গেয়ে যাচ্ছে। মরা পাতার পচা মিষ্টি গন্ধ আসছে। কনিয়াক আর হাভানা চুরুটের জন্য হাহাকার লাগে। দিঘির জল, বন, দিঘির পাশে একটু খোলা প্রান্তর, আমাকে আমার প্রিয়তমের মতো জড়িয়ে ধরে রাখে। এমন করে, যেন কোনোদিন ছেড়ে যাবে না। নানা জাতের পাখির কাকলি। এই অশান্ত সঙ্গীত নিজের খেয়ালে বেজে যাচ্ছে। একটা সময় ছিল যখন কোনো অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মুখোমুখি হলে আমার মেয়ের জন্য প্রার্থনা করতাম। আর করতাম শিহাবের জন্য, যেন সে মন্ত্রী হয়। যেন তার মাথা সবসময় উঁচু থাকে। প্রায় প্রতিটি নিঃশ্বাসে প্রার্থনা করতাম তার জন্য।

সাত-আট মাস আগে মুহিব নামে আরেকজনের সাথে সম্পর্ক হয়েছিল, শিহাবকে হারানোর ক্ষত তখনও দগদগে। আমার কাছে নিয়মিত আসত। কখনও আমার রূপের বা গুণের একবিন্দু প্রশংসা করেনি। মুহূর্তের জন্যও বলেনি সে আমাকে পছন্দ করে বা ভালোবাসে। অথচ যখন আমাকে স্পর্শ করত, তা করত পরম যত্নে আর মমতায়। এত আলতো, এমন সংবেদনশীলতায়, যেন ক্রিস্টালের তৈরি পুতুল স্পর্শ করছে।

স্ত্রীর সাথে ডিভোর্স হয়ে গেছে। একমাত্র মেয়ে অস্ট্রেলিয়ায় পড়ে। একদিন ফোন করে জানাল তার ট্রান্সফার হয়েছে লন্ডনে। দু'দিন পরই চলে যাচ্ছে। এর আগেও সাত-আট বছর লন্ডনে চাকরি করেছে।

লন্ডন থেকে প্রায় প্রতিদিন সে ইমেইল বা এসএমএস পাঠায়:

'I hope you are fine. I am OK, but still a bit "lazy" and not focused.'

'I am sitting in my office and looking out at RAIN, RAIN and even more rain.'

'I look forward to the weekend. I have no big plans for it, maybe some night clubs.'

'It has been a long period since I did any physical training, but now I am back on track and I am motivated. I am actually going to the gym after I send you this mail. Later this afternoon I am invited by my neighbours for dinner. He is a Norweigian, married to a British lady. The are very nice and have helped me a lot since I came to London for the first time.'

'Last evening , I went to a night club. I even danced, which I seldom do.'

‘I have registered in a course: “how to make South Italian food”. This course is held close to where I live. I am a bit curious. I am sure I will pick up some new practical knowledge.

‘The Italian food evening class yesterday was excellent. Good atmosphere, a lot of useful advice. We were only 9 participants there. I will have to practice some of the dishes, perhaps Saturday or Sunday, when I’ll have a bit of time.’

‘Today I am working on a lecture I am going to give next week. I bought 2 more paintings (as well as 4 black-and-white photos) on Sunday. I just walked by an art gallery and decided to go inside for a look.’

‘My daughter mailed me yesterday, she is in doubt whether she should take a break in her studies (for 6 months– backpacking in New Zealand or Aus) or continue with her studies. She asked for my opinion.’

‘Last evening I was a bit depressed and decided to go out just to see people. I went to a bar downtown, but it was no fun at all. I had one glass of wine & went home.’

‘I got hold of my daughter, and she was in a good mood, looking forward to see her tomorrow in Sydney. She has an exam on Monday.’

‘I will be in Thailand on the 21st, next Friday. I will return to London 14 December. ’

‘Best regards from Thailand. Presently, I am in Ao Nang. Tomorrow I have a ferry ticket to Phi Phi. I will stay there till Friday. Then I will take the ferry to Phuket and spend one night there. Saturday afternnoon I will fly back to Bangkok and then it is a flight to London late in the evening.’

‘I am fine, I was stuck in Bangkok for a few extra days, due to the demonstrations. I had a ticket for Krabi, flying south 26th, but I have postponed it till 4th December. Presently, I am on an island, Koh Chang, close to the Cambodian border. I took a bus for 5 hours, plus a ferry. I am staying at a nice resort. I rented a bungalow down at the sea. This morning I was awake because of the sound from the waves. Today, I went to a very nice fishermen village, the place was just lovely.’

রাতে ঘুমানোর আগে আইপড, চাদর, বালিসসহ ছাদে চলে যাই। জোছনায় রুপালি আলোয় ছাদ, উঠান, অরণ্য, সমস্ত চরাচর কাঁপছে, এক স্নিগ্ধ রুপালি পর্দা দুলছে পৃথিবীময়। আইপড নিয়ে এলেও গান শুনি না, ঝিঁঝিঁপোকার সঙ্গীত এবং

বাতাসের মর্মর মধুরতর মনে হয়। আকাশভরা নক্ষত্র, জোছনা, রাতের নিজস্ব যত শব্দ আর হালকা কুয়াশার নিচে শিশুর মতো ঘুমাই। ভোররাতের দিকে স্বপ্নে দেখি বৃষ্টিতে ভিজছে আমার মেয়ে লিরা, নগ্ন শরীর, চুল, মাথা বেয়ে টুপ টুপ পানি পড়ছে। একটা দিঘির কিনারে দাঁড়িয়ে কাঁদছে। তার চারপাশে প্রায় কোমর সমান উঁচু লম্বা-লম্বা ঘাস। পাশে অস্বাভাবিক লম্বা একজন সাদা-চামড়ার লোক দাঁড়িয়ে।

ভোর রাতে ঘুম ভেঙে গেলে দেখি আকাশে চাঁদটাকে গোল ঘষা কাঁচের মতো দেখাচ্ছে। ঘন কুয়াশা মাকড়সার জালের মতো ছড়িয়ে আছে। বাইরে ঘুমিয়ে ঠাণ্ডা লেগে গেছে আমার। ঘরে ফিরে যাই। ঘরে ঢুকেই মেয়েকে ফোন করে বলি, "তোমাকে নিয়া দুঃস্বপ্ন দেখলাম। কেমন আছো? দেখলাম বৃষ্টিতে ভিজতেছ আর কানতেছ। সাদা-চামড়ার একজন তোমাকে আমার কাছে আসতে দিতেছে না।"

ফোনের ওপাশে মেয়ে জবাব দেয়, "মজার স্বপ্ন দেখছ, আম্মু। লম্বা ড্যানিশ একটা ছেলের সাথে প্রেম হইছে রিসেন্টলি। খুবই কিউট দেখতে। তোমারে ছবি পাঠাইয়া দিব। আর বাংলাদেশ নিয়া তার আগ্রহও অনেক। লেবানিজ যে-বয়ফ্রেন্ডটা ছিল সে অনেক বাজে ছিল বলে ছেড়ে দিছি।"

তারপর আরও কিছুক্ষণ আমার গেস্টহাউসের সব মেয়েদের খোঁজখবর সে নেয়। দেশে এলে গেস্টহাউসের সব "খালা"দের জন্য গিফট নিয়ে আসে। মেয়েরাও সবাই তার জন্য নানা পদের রান্না করে, জামাকাপড় কিনে দিয়ে, তার দেশে থাকার প্রতিটা মুহূর্ত উৎসবমুখর করে রাখে। লিরা যখন ছোট ছিল, চেষ্টা করতাম আমার পেশা তার কাছে লুকিয়ে রাখতে। তাকে বলতাম, অনেক ছোটবেলাতে তার বাবা মারা গেছে। ক্লাস এইটে উঠে বেশ আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠে সে, তখন সত্যের মুখোমুখি করি তাকে। আমার ধারণা ছিল মুষড়ে পড়বে। তাকে বুঝিয়ে বলি, "আমার বাস্তবতায় এ-ছাড়া আর কোনো বিকল্প ছিল না।" তারপর বলি,"দ্যাখ, আমি আপাদমস্তক স্বাধীন একজন মানুষ। এটা কি কম পাওয়া?" অনেকক্ষণ চুপ থেকে বলে, "আম্মু, তুমি যা-ই হও, তুমি পৃথিবীর সেরা আম্মু। হোয়াটএভার ইউ আর, আই রেসপেক্ট ইউ নান দ্য লেস।"

লিরার সাথে কথা বলে, রুমে আলো বন্ধ করে আবার শুয়ে পড়ি। সকাল ছটায় ঘুম আসে। দুপুরে ঘুম ভাঙলে ঢাকায় আমার বাসায় ফোন করে বলি ড্রাইভার পাঠিয়ে দিতে। গাজীপুরের এই বাড়ির কেয়ারটেকার রহমতকে সাথে নিয়ে নেই। তাকে ডাক্তার দেখাতে হবে। বেশ কিছুদিন তার খাওয়াদাওয়ায় অরুচি এবং জ্বর-জ্বর যাচ্ছে। জাফরানের কাছ থেকে গাজীপুরের বাগানবাড়ির সাথে তার কেয়ারটেকার রহমতকেও পাই। তখন থেকেই আমি এবং রহমত দু'জনই দু'জনের প্রতি প্রয়োজনের অতিরিক্ত স্নেহশীল। রহমতের সন্তানদের পড়ালেখা, সংসার, সবকিছুরই খরচ এখানকার আয়

দিয়ে চালায়। তাকে বলি স্ত্রী-সন্তানের সাথে এখন বাড়িতে থাকতে পারে। সে ওখানে থাকলেও তার বাড়িতে প্রতি মাসে টাকা পাঠিয়ে দেব। বা তার বউকেও এ-বাড়িতে এনে রাখতে পারে। সে রাজি হয় না। বলে, "এই বাড়ি ছাইড়া অন্য কোনোহানে আমার ভালো লাগে না, এই জঙ্গল, বাগান ছাইড়া কোথাও গেলে দুই দিনে আমার নিশ্বাস বন্ধ হইয়া যায়। এইখানেই আমি মরতে চাই।" মাঝে মাঝে তার স্ত্রী-সন্তানেরা ঐ বাড়িতে গিয়ে কিছুদিন তার সাথে কাটায়। তারা এলেও, দু'চারদিনের মধ্যে তাদের বাড়ি পাঠিয়ে দেয়।

ঢাকায় ফিরে রাজনকে ফোন করলেই বলে, "কালকে সন্ধ্যায় আমি আসতেছি, সন্ধ্যাটা ফ্রি রাইখো।" সেদিন সন্ধ্যায় পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ইশতিয়াক হাসান বলে, "সুইটহার্ট, তোমার লেজের নাগাল পাওয়া যায় না। ঢাকায় তো থাকোই না। আজকে সন্ধ্যায় গুলশান ক্লাবে আসো।" আমি বলি, "গাজীপুর থেকে ফিরলাম বিকালে, খুবই টায়ার্ড। দুয়েকদিন পর তুমি সময় করে বাসায় এসো, শায়লার কাছে

খোঁজখবর নিয়ে।" আমার এই গেস্টহাউসটা দেখাশোনা করে আমার বহুদিনের পুরনো বান্ধবী শায়লা। কাস্টমার ম্যানেজ করা, মেয়েদের দেখাশোনা করা, ট্রেনিং, হিসাবপত্র, পুলিশ প্রশাসন, কানেকশন, সব সামলায় নিপুণভাবে।

সন্ধ্যার পর টিভি অন করে দেখি শিহাবকে দেখাচ্ছে টক-শোতে। আক্ষেপ হয়, কেন তাকে নিয়ে প্রেস-কনফারেন্স করলাম। নিজেকেই শস্তা করলাম সারাদেশের মানুষের কাছে। তার তো কোনো ক্ষতি হয়নি। পরদিন সকালে দেখি নাকফুলের চারপাশটা ফুলে লাল হয়ে আছে। ব্যথায় টনটন করছে। অয়েন্টমেন্ট দিতে গিয়ে নাকফুলে একটু চাপ লাগতেই হীরার নাকফুলের নীচ থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়তে থাকে। ব্যথায় সারাদিন কাতরাই। মনে পড়ে ডাক্তার বলেছিল নাকফুলটা খুলে ফেলেন, সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি জানি এই নাকফুল খুলব না আমি। সন্ধ্যায় রাজন এসে আমাকে দেখে চিৎকার করে ওঠে, "তোমার নাক তো ফুলছেই, চোখের নীচ, গাল সব ফুলে গেছে, ডাক্তারের কাছে চলো।"

আমি বলি, "ডাক্তারের কাছে যাওয়া লাগবে না।" ওকে জিজ্ঞাসা করি, "তুমি তো একজন পুরুষ মানুষ, তুমি বলো তো শিহাব কেন আর যোগাযোগ রাখল না। কেন ছেড়ে গেল আমাকে। আমার একটু মন খারাপ দেখলেও ছোট বাচ্চার মতো আদর করেছে আমাকে। প্রতিদিন বহুবার ফোনে কথা বলেছে। হঠাৎ কেন যোগাযোগ বন্ধ করে দিল! লজ্জার মাথা খেয়ে কতবার ফোন করলাম, একবারও ধরল না আর।"

রাজন বলে, "প্লিজ ঐ লোকের কথা থামাও। নাকফুলটা ছুঁড়ে ফ্যালো, নাইলে মারা যাবা। নাকটা ইনফেকশন হয়ে তোমার চেহারা ভয়ংকর দেখাইতেছে।" অনেকটা সময় নীরবে তার বুকে মুখ গুঁজে শুয়ে থাকি। রাত সাড়ে দশটায় সে উঠে চলে গেলে দরজা বন্ধ করে দেই। বিছানায় নিশ্চল শুয়ে থাকি। তারপর চিৎকার করে কাঁদি। শেষে ঘুমের অষুধ খেয়ে ঘুমাই। সকালের দিকে স্বপ্নে দেখি শিহাবের সাথে গল্প করছি, আহ্লাদে

গলে যাচ্ছি। ঘুম ভেঙে যায় নাকের ব্যথায়। নাকফুলের চারপাশে টিশুপেপার চেপে ধরি। স্বপ্নে তাকে এত জীবন্ত, এত সত্য মনে হয়েছে যেন তার শরীরের গন্ধ আমার গায়ে লেগে আছে। আয়নায় দেখি নাকের চারপাশে রক্ত শুকিয়ে জমাট বেঁধে আছে। বামপাশের চোখ ফুলে বন্ধ হয়ে যাবার জোগাড়। মনে মনে বলি, শিহাব, কুত্তার বাচ্চা, আই হেইট ইউ।

সকাল নয়টার দিকে শিহাবকে মোবাইলে ফোন করি। বেশ কিছুক্ষন রিং বাজার পর সে ফোনটা ধরে। দুইবার হ্যালো বলি। সে আমার গলা শুনে লাইন কেটে দেয়।

আবার ফোন করি। রিসিভ করে না। এই অপমান আমার নিয়তি। তা না হলে এত বন্ধু-আপনজন থাকার পরও তাকে কেন ফোন দেই? ঘর অন্ধকার করে বিছানায় শুয়ে থাকি কিছুক্ষণ। তারপর একটা কাগজে লিখি, "লিরা, মাফ করে দিস মা'কে।" তারপর ম্যাচ জ্বেলে দেই আমার নাইট গাউনে। আমার দু'পা জুড়ে দাউ দাউ আগুন উপরে উঠছে। তীব্র ব্যথায় আর আগুনের উন্মত্ত শিখা দেখে মনে হয় মারা যাচ্ছি এখন। যন্ত্রণা অসহ্য হয়ে ওঠে। রুমের দরজা খুলে করিডোর ধরে ছুটে রান্নাঘরে যাই। কাজের মেয়ে রাহেলা প্রথম দেখে আমাকে। তার বিলাপ আর চিৎকারে বাড়ির সবাই জড়ো হয়। কেউ একজন পানি ঢালে আমার গায়ে। তারপর সম্ভবত বেহুশ হয়ে যাই।

ঢাকা মেডিকেল হাসপাতালে আমার চারপাশে শায়লা, রাজন, রহমত, লায়লি সবাই। স্যালাইন দেওয়া। ডাক্তার ড্রেসিং করছে। ডাক্তার আশ্বস্ত করে, "ঠিক হয়ে যাবে, ইনশাল্লাহ।" রাজন কানের কাছে এসে বলে, "কেন এমন করলা, সোনা?" শায়লা বলছে, "আল্লাহ বাঁচাইছে, চুলে আগুনটা লাগে নাই। চুলে পৌঁছাইয়া গেলে তোমারে কেউ বাঁচাইতে পারত না।"

একদিন পর-পর ড্রেসিং করে। অ্যানেসথিসিয়া দেয়। ঘুমের ওপর ভাসতে-ভাসতে অনেকগুলো বর্গাকার, সাদা-সাদা ঘর পার হই। একটা সাদা-এপ্রন নার্সকে দেখা যায়। তাকে প্রাণপণ বলতে চাই, আমাকে একটা টেলিফোন দাও, শিহাবকে শুধু বলব– আমি মারা যাচ্ছি। রাজন আমাকে ব্যাংককে পাঠানোর আয়োজন করে। লিরা ফোনে কাঁদে, "তুমি তো আমার আম্মু, তুমিই বাবা। কেন একবারও আমার কথা ভাবো নাই?"

লিরা শায়লাকে বলেছে, যতদ্রুত সম্ভব যেন ব্যাংকক নিয়ে যায় আমাকে। পরের ফ্লাইটে সে ব্যাংকক যাবে। শায়লা যাচ্ছে আমার সাথে। রাজন ঢাকা এয়ারপোর্টে বিদায় দেয়। লোকজনের সামনেই আমার মাথায়, কপালে চুমু খায়। স্ট্রেচারে যখন আমাকে নিয়ে যাচ্ছে তার মুঠোবন্দি আমার হাতটা ছেড়ে দেয় সে। ওর দু'গাল বেয়ে পানি গড়াচ্ছে।

দারফুর, ২০০৯

প্র কা শি ত গ ল্পে র আ লো চ না

মা সু দু ল হ ক

বহুবার বলা গল্প

শাহ্নাজ মুন্নীর গল্পের আমি পুরাতন ভক্ত। তার গল্পের বিষয়বৈচিত্র্য ও বর্ণনা আমাকে সব সময়ই আকৃষ্ট করে। মুক্তিযুদ্ধকে পটভূমি করে লেখা 'বহুবার বলা গল্প'টি নামকরণ থেকে শুরু করে একক চরিত্র উপস্থাপনে ও কাহিনী বিন্যাসে শাহ্নাজ মুন্নীর শিল্পবোধ ও কলা নৈপুণ্যের পরিচয় মেলে। এ গল্প পাঠে ছোটগল্পের ভাবব্যঞ্জনা সৃষ্টিতেও তার কতখানি ক্ষমতা আছে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। একটি চরিত্রের জবানির মধ্য দিয়ে শাহ্নাজ মুন্নী চমৎকারভাবে মুক্তি-যুদ্ধের সময়কার পাকবাহিনীর বীভৎস নারকীয়তা তুলে ধরেছেন। গল্পটি কিছুই না; মুক্তিযুদ্ধের দীর্ঘদিন বাদে মুক্তিযোদ্ধা এক দাদু, যুদ্ধের স্মৃতি নিয়ে একটি ঘটনার বারবার গল্প শোনায়। ক্যাম্পে বাঙ্কারে বন্দিদশায় তার এবং অন্যদের ওপর নির্যাতনের কাহিনীচিত্র নিয়ে এ গল্পের সকল আয়োজন। কিন্তু এর প্রসাদগুণটি হচ্ছে শাহ্নাজ মুন্নীর ভাষা ও তার বর্ণনারীতি। উত্তম পুরুষে লেখা এ-গল্পটি প্রথম থেকে শেষপর্যন্ত

একটা টানটান চেতনা কাঠামো নিয়ে এগিয়ে গেছে। শাহ্নাজ মুন্নীর এ গল্পের ভাষার একটু নমুনা পেশ করছি: "একটা ঠাণ্ডা ভেজা স্যাঁত স্যাতে মাটির গর্তে ততোধিক স্যাঁতস্যাতে ঠাণ্ডা ভয় নিয়ে মাথা নিচু করে উবু হয়ে বসে আছি। বসে আছি মানে আরো কয়েকজনের সাথে আমাকেও বসিয়ে রাখা হয়েছে। যেটাকে মাটির গর্ত বলছি আসলে সেটা মাটি খুঁড়ে তৈরি করা একটা বাঙ্কার। অনেকটা কবরের মতো থমথমে অন্ধকার। বাঙ্কারের ভেতর ঘাপটি মেরে বসে শুনতে পাচ্ছি দূরে কোথায় যেন থেমে থেমে গুলির আওয়াজ হচ্ছে। এরপর কী যে হবে আন্দাজও করতে পারছি না। কালকে রাতে ওরা আমাকে বাসা থেকে ধরে এনেছে। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর পরই আমি আখাউড়া সীমান্ত পাড়ি দিয়ে চলে গিয়েছিলাম ইন্ডিয়া। গত রাতে, কেবল গত রাতেই দেশে ঢুকেছিলাম হাইকমাণ্ডের নির্দেশে কিছু প্রচারপত্র বিলি করব বলে, মা'ও অসুস্থ ছিল, ভেবেছিলাম সেই সাথে মাকেও দেখে আসা যাবে... কিন্তু কিভাবে যে খবর পেয়ে গেল ওরা...।"

এ-রকম বর্ণনার মধ্য দিয়েই শাহ্নাজ মুন্নী পাঠককে নিয়ে যান গল্পের অতল সন্ধানে। একটি চরিত্রের বর্ণনার মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধ সময়কার বাঙালিদের বিপন্ন দশার

অনেক চরিত্রের বিস্তার ঘটিয়েছেন এ গল্পে। একক চরিত্রপ্রধান এ গল্পে মুক্তিযোদ্ধার ব্যাকুলতা, বেদনা, দ্রোহ ও ক্রোধ প্রকাশ পেয়েছে এবং গল্পের বিস্তার ও শেষ পরিণামে সময় ও কালকে ভেঙে গল্পকার মুক্তিযুদ্ধের কাহিনীকে বাস্তবতার নিরিখে চিরকালীন করে তোলেন এ-ভাবে : কিভাবে ছাড়া ছাড়া পেয়েছিলাম কিংবা আদৌ ছাড়া পেয়েছি কি-না, তাই তো বুঝতে পারি নারে ভাই, এখনো তো মনে হচ্ছে একটি ঠাণ্ডা ভেজা স্যাঁতসেঁতে মাটির গর্তে ততোধিক স্যাঁতস্যাতে ঠাণ্ডা ভয় নিয়ে মাথা নিচু করে উবু হয়ে বসে আছি। এটা কি মাটির গর্ত নাকি মাটি খুঁড়ে তৈরি করা বাঙ্কার। ...এই যে সময় ও কালকে ভেঙে দিয়ে শাহ্নাজ মুন্নী মুক্তিযোদ্ধার বর্তমান উপলব্ধিকেও প্রকাশ করছেন, এই উপলব্ধির মধ্যে আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক চেতনা নিখাদ বাস্তবতা নিয়ে উপস্থিত। এ উপলব্ধি পাঠকের চেতনাকে নাড়া দেয়। আর এভাবেই গল্পটি শিল্প-সার্থকতা লাভ করে।

শাহ্নাজ মুন্নীর এ গল্পে অনেক ক্ষেত্রে নাট্য উপস্থিত। এ-গল্পের সংলাপ সংযোজনে মুন্সিয়ানা রয়েছে। সংলাপ ও বর্ণনার মধ্য দিয়ে তিনি এ-গল্পের প্রধান চরিত্রের অন্তর্জগৎকে নিপুণ ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। মুক্তিযুদ্ধের কাহিনীবিন্যাসের কৌশলে এবং মুক্তিযোদ্ধার চরিত্রাঙ্কনের নৈপুণ্যে শাহ্নাজ মুন্নী এ-গল্পে আশ্চর্য সাফল্য অর্জন করেছেন বলে আমার মনে হয়েছে।

পরালালনীল

গল্পে প্রচলিত জীবনধারাকে প্রত্যাখান করে স্বাধীন চেতনাসম্পন্ন সম্মানীয় বেশ্যার জীবন চরিত্র উন্মোচন করেছেন গল্পকার রাশিদা সুলতানা তার পরালালনীল গল্পে। এই গল্পকারের এটিই আমার প্রথম পাঠ। কর্পোরেট পুঁজির প্রভাবে বিগত কয়েক বৎসরে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতির যে পরিবর্তন ঘটে গেছে; বিশেষ করে উচ্চবিত্ত সমাজের; তার একটি বিশেষ জায়গায় আলো ফেলেছেন গল্পকার। গল্পটি পাঠ করতে করতে বাংলাদেশের একটি বিশেষ দলের নির্বাচিত এম.পি, প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের অসামাজিক যৌন জীবনের প্রায় পুরো চিত্র ফুটে উঠেছে আমার চেতনায়। গল্পের মূল চরিত্রের মধ্য দিয়ে আমি সেই ব্যক্তিদের চিনে নিই। এই অর্থে গল্পটি একটি বিশেষ কালের ইতিহাসও বটে। এই গল্পের মূল চরিত্র লিপি, যার জীবনটা অনেকটাই আমার

কাছে মনে হয় গ্রীক নারী-কবি সফো'র মতো। আবার চর্যার সময়কার ডোম্বির সঙ্গে মেলে। নারী চরিত্রের সঙ্গেও পার্থক্যের জায়গাই হচ্ছে ডোম্বি নিম্নজন হিসেবে উচ্চশ্রেণীর যৌনসঙ্গী হতেন রাতের অন্ধকারে এবং দিনের বেলায় নিম্নবিত্ত জীবন-যাপন করতেন। কিন্তু এই গল্পের 'লিপি' উচ্চবিত্ত ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে অর্থের বিনিময়ে প্রথমে

যৌনসঙ্গী এবং পরবর্তী সময়ে যৌনকর্মীর আড়তদার হলেও সে উচ্চবিত্তীয় জীবন-যাপন করে। রাষ্ট্রের এম.পি, পুলিশ কর্মকর্তা, সচিব, ব্যবসায়ী শ্রেণী তার ভোক্তা এবং বন্ধু– দুটোই। এ থেকে বর্তমান সমাজ-রাষ্ট্রের চরিত্র যেমন উঠে আসে তেমনি এক হাজার বছর আগের প্রাচীন বাংলার নারী পেশাজীবীর সঙ্গে বর্তমান নারী পেশাজীবীর গুণগত বা দোষগত দিকটিও ধরা পড়ে।

গল্পটি আমার ভালো লেগেছে। ভালো লাগার অনেক কারণ। গল্পটির চমৎকার বর্ণনা মনোযোগ স্থির রেখে সামনে নিয়ে যায়। গল্পকার খুব নিপুণভাবে উচ্চবিত্ত স্তরের গণিকাদের জীবন গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন বলে মনে হয়, ফলে গল্পের আয়োজনটা শক্ত ভিতে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। বলতে হবে গল্পকারের দেখা ও বিশ্লেষণের সামর্থ্য রয়েছে। গল্পকারের সামান্য একটু বর্ণনা পেশ করছি : "যদিও টাকার জন্য করতাম, তার পরও শুরুর দিকে জাফরানের সামনে নগ্ন হতে গ্লানি বোধ হত। মনে হত পয়সার জন্য এত বৃদ্ধ এক লোকের সঙ্গে শুচ্ছি। তাছাড়া বয়সের কারণে তার মুখ থেকে গন্ধও বের হত। অথচ জাফরানই আমার জীবনটা বদলে দিল। শুরুর দিকে তার বাগানবাড়ির চাবিটা সে আমাকে দিয়ে দেয়। পরে বারিধারার একটা অ্যাপার্টমেন্ট। এবং তার সহায়তায়ই একজন সাধারণ বারবনিতা থেকে একজন পুরোদস্তুর ব্যবসায়ী হয়ে উঠতে পারি।"– এখানে লক্ষ্য করার মতো যে গল্পকারের দেখা ও বিশ্লেষণের মধ্যে বয়স্ক লোকের মুখের দুর্গন্ধও বাদ পড়েনি।

এই গল্পে সমকালীন রাজনীতি প্রসঙ্গে চমৎকার অনুধাবন উঠে এসেছে। মানুষের আদিম প্রবৃত্তি এবং পুরুষতান্ত্রিক সমাজকাঠামো নতুন বিন্যাসরীতির চারিত্র ফুটে উঠেছে। পাশাপাশি নারীবাদী চিন্তার চূড়ান্ত রূপ জরায়ুর স্বাধীনতার বিষয়টিও গল্পকার তুলে ধরেছেন লিপি চরিত্রের মধ্য দিয়ে। নারী-পুরুষ; যে-কোনো মানুষের জন্যেই যে স্বাধীনতা অনিবার্য সেই দার্শনিক সিদ্ধান্তটিও এই গল্পে নানাভাবে উন্মোচিত হয়েছে। নগর সভ্যতার এই অস্থির মানুষদের অস্তিত্ব চেতনার গভীরে কীভাবে প্রকৃতি চেতন-অচেতনে মিশে থাকে তা বোঝা যায় এই গল্প পাঠে। এই গল্পে রাতের ছাদের আকাশ কি মুক্তির প্রতীক নাকি নিশ্বাস নেবার বেঁচে থাকার শেষ আশ্রয়স্থল! বালিশ আর চাদর নিয়ে গল্পে বেশ কয়েক বার লিপি ছাদের উন্মুক্ত আকাশের নিচে আশ্রয় নেয়। গল্পকারের কুশলী বর্ণনায় বালিশ আর চাদর হয়ে ওঠে জীবন আর যৌনতার প্রতীক।

গল্পটি ভালো লাগার এ-রকম অনেক বিষয় আছে। স্বাধীনচেতনা সম্পন্ন সম্মানীয় বনিতার জীবনচরিত্র উন্মোচনের এ প্রক্রিয়াটি অন্তত আমার পাঠক সংবেদনাকে অনেক খানি স্পর্শ করতে পেরেছে।

প্র ব ন্ধ

র হ মা ন হে ন রী

....

শহীদুল জহিরের গল্পে সময় ও বিপন্নতার চলচ্চিত্রায়ণ

গভীর জলের মাছ বাগপ্রচলটির কথা স্মরণ হ'লে, আমরা, শহীদুল জহিরের গল্পভঙ্গিমায় অভ্যস্ত পাঠকমাত্রেই, মনে করতে পারি যে, মাছ ও জল অনুষঙ্গ দুটি নিয়ে পুনর্ভাবনা হয়তো-বা জরুরি কিংবা জরুরি না হ'লেও, আপাতত, এই রচনায় সাধারণত আমরা তেমনটিই করব; কেননা, মৎস্য-বিভাগের মৎস্যপক্ষ কিংবা ওই জাতীয় নানা কর্মসূচির বদৌলতে, আমরা, কৃষিজীবী পরিবারের উত্তরাধিকারীরা, ইতোমধ্যেই জেনে ফেলেছি যে, পুকুরে কিংবা প্রাকৃতিক মৎস্যচারণক্ষেত্রে, মাছ প্রধানত তিনটি স্তরে বিচরণ করে ও বেড়ে ওঠে। শহীদুল জহিরের গল্প প্রসঙ্গে, আমরা, যারা ওজনদার আলোচক নেই, পাঠকমাত্র, এযাবৎ যতরকম কথাবার্তা ও আলোচনা শুনি বা জানতে পারি কিংবা মুদ্রিতকথা যা-কিছু পাঠ ক'রে থাকি, সেইসবে আমাদের কেবলই মনে হয় যে, তাঁরা যেন জলের প্রথমস্তরে বিচরণশীল মাছকথা বলেন। আমরা, অতএব, মনে করি যে, জীবন এমন এক বৃত্ত বা বৃত্তের মতো ব্যাপার এবং সময়ও; যার কেন্দ্রে পৌঁছে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতাসহ তাকে (জীবন ও সময়কে) দেখতে, বুঝতে ও জানতে না শিখলে, অন্যের চোখে দেখলে, গঠিত বিদ্যার চশমা দিয়ে দেখলে কিংবা পরিধি থেকে পক্ষিদৃষ্টি ফেললে, জীবন ও তার বাস্তবতার ব্যাপারটাকে অন্যরকম লাগে; মনে হয়, ওই দেখার নিচে আরও দুই কি বেশি-স্তর অদেখা থেকে যায়। নজির উপস্থাপনে, এই পর্যায়ে, আমাদের বাসনা করে ব'লে, আমরা, গোলাপি রঙের একটা ডিম-লাইট, শাদা দেয়াল, শাদা আসবাব ও শাদা শয্যাবিশিষ্ট কোনও কক্ষের মধ্যে হাজির করব। আমরা লাইট জ্বেলে দেব এবং দেখব যে, পুরো কক্ষই গোলাপিবর্ণ ধারণ করবে। এবার লাইটটি নিভিয়ে দিয়ে আবার লক্ষ করব; কক্ষটি শাদাবর্ণ ফিরে পাবে।

কিন্তু এই ঘটনা সম্পর্কে যাদের স্পষ্ট ধারণা থাকবে না অর্থাৎ বালকেরা, তারা মনে করবে যে, হয়তো-বা ঘরের মধ্যে কোনও জাদু সৃষ্টি হয়; ফলে শাদাবর্ণ গোলাপি হয়ে ওঠে। তখন আমাদের স্মরণ হবে যে, গত শতাব্দীর আশির দশকে, আমরা যখন পশ্চিমবাঙলার ছোটকাগজ কি বাংলাদেশের দৈনিকী সাহিত্য-পাতা কি মূল বা অনুবাদ-গ্রন্থের কল্যাণে কিংবা অন্যান্য কারণে, জানতে পারি যে, সেখানে, দক্ষিণ আমেরিকার

গল্পে জাদুবাস্তবতা হয়; তখন আমরা, বোধকরি, ভুলে থাকি যে, জীবন, বিশেষত তৃতীয় দুনিয়ায়, স্বয়ং এমন এক জটিল-বহুমুখী-রহস্যময় বাস্তবতার ভাণ্ড যা, এমনকি, কল্পকাহিনীকেও হার মানায়; স্বাধীনতার ৩৫ বছর পর আমাদের মনে পড়ে–মঙ্গা কী? তারপর, বহু বহু বছর কেটে গেলে, আমাদের জীবনেও এমন এমন বাস্তব ঘটনা ঘটে অথবা ঘটবে যে, যা বর্ণনা করলে অন্য কারও মনে হয় কিংবা মনে হবে যে, না ভাই, আপনে বোধ হয় জাদুবাস্তবতা করেন! এইগুলান আবার কারও জীবনে সত্যি সত্যি ঘটে নাকি? তবু আমাদের স্মরণে আসবে যে, শহীদুল জহির নামের কোনও মানুষ আমাদেরকে, আমাদেরই জীবনের গল্প শোনান; নিরীহ, আটপৌরে, স্মিতবাক ও নির্লিপ্ত সেই গল্পের মানুষেরা এতই শাদামাঠা, গোবেচারা যে, মাঝে মাঝে, আমাদেরও আবার অবিশ্বাস হয়– না ভাই, এইগুলান তো আমাদের জীবনের চলমান ও নিরামিষ ঘটনা; আপনে বোধ হয় মশকরা করেন, আপনি আমাগো ভোন্দাই বানাইবার চান, এইগুলান আবার গল্প হয় নাকি? আপনে বোধ হয় জাদুবাস্তবতা করেন! কেননা, আমাদের স্মরণ হবে যে, নব্বই দশকে, তাঁর গল্প সম্পর্কে আমাদেরকে কেউ-কেউ অনুরূপ ধারণা দেন যে, তাঁর 'ডুমুরখেকো মানুষ' হয় ওইরূপ। প্রমাণস্বরূপ, তাঁরা, নব্বই-দশকী সমঝদারগণ, জানাতে ভোলেন না যে, 'কাঠুরে ও দাঁড়কাক', কিংবা 'মনোজগতের কাঁটা' বাস্তবে একেবারেই অসম্ভব; উনি তো লাতিন আমেরিকার জাদুবাস্তবতা করেন! এবং আমরা আরও এক বিভ্রান্তির ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে প'ড়ে রীতিমতো হাবুডুবু খেতে থাকি, যখন কোনও এক লিটল ম্যাগাজিনে, আমাদেরই কালের কোনও সিরিয়াস-গল্প লেখক, এইসব গল্পকে 'আখ্যান বয়ানের এ-এক মহা ইন্দুর-বিলাই খেলা' বলেন; কিংবা বলেন 'কল্পনা আর আখ্যান বয়ানের একরোখা তেজ'।

শহীদুল জহিরের গল্পের একঘেয়েপনা যখন তাঁকে বিরক্ত করে এবং উক্ত আলোচক এইসব গল্পের জাদুস্পৃষ্ট হয়ে বলেন 'বাস্তবের বিপরীত বাস্তব'; তখন আমরা পুনরায় এক ঘোরের মধ্যে প'ড়ে যাই এবং তাঁরই গল্পগ্রন্থের নামের মধ্যে অর্থাৎ 'কুহকবিভ্রম'-এ পেঁচিয়ে যেতে যেতে শহীদুল জহিরের গল্পের তুলনামূলক পাঠ সংগ্রহে উদ্যোগী হই। আমরা একে একে পাঠ করি– হুজুর কেবলা, তেলেনাপোতা আবিষ্কার, পোনাঘাট পেরিয়ে, সুধাকর, জননী, তুচ্ছ, বেহুলার ভেলা, ক্রীড়াভূমি, অবেলা, পা, চর্যাপদের হরিণী, গণতন্ত্রের রাস্তা, সাদা অ্যাম্বুলেন্স, মনীষার দুই প্রেমিক, পোকামাকড়, মাড়িয়ে যাওয়া; পুনরায় পাঠ করি– কোরবানী, পথ, একটি তুলসী গাছের কাহিনী, জোঁক, মাংস, পানকৌড়ির রক্ত, জলবেশ্যা, আত্মজা ও একটি করবীগাছ, কালো মাফলার, যুগলবন্দী, স্বগত মৃত্যুর পটভূমি, অবিনাশের মৃত্যু, রংরাজ ফেরে না, হাত, গুহা, এত আলো, ভূতের সাথে যুদ্ধ, শবযাত্রা, পিতৃভূমি, মাটিপুরাণ পালা কিংবা ছায়াদণ্ডী এবং আরও আরও গল্প। আমরা পাঠ করি এবং আমাদের মনে হয় যে, ঘটনা-কাহিনী ও গল্পের তফাত সম্পর্কে আমরা যেন আরও সতর্ক হ'তে চাই। ফলে, আমরা ফিরে যাই আরও চৌদ্দটি গল্পের দিকে–ডুমুরখেকো মানুষ, কাঠুরে ও দাঁড়কাক, এই সময়,

মনোজগতের কাঁটা, ধুলোর দিনে ফেরা, চতুর্থ মাত্রা, আমাদের কুটিরশিল্পের ইতিহাস, আগার গাঁ কলোনীতে নয়ননতারা ফুল কেন নেই, কোথায় পাবো তারে, আমাদের বকুল, মহল্লায় বান্দর, আব্দুল হালিমের মা এবং আমরা, ইন্দুর বিলাই খেলা, প্রথম বয়ান এবং ডলু নদীর হাওয়া; এইসব গল্পে যখন আমাদের সময় ও জীবনের বিপন্নতা ছাড়া কোনও কল্প-আখ্যান কিংবা জাদুবাস্তবতা খুঁজে পাই না; তখন আমরা অসহায় বোধ করি এবং অনুসন্ধানের হাত বাড়িয়ে পৌঁছে যাই দক্ষিণ আমেরিকার কথাসাহিত্যের কাছে, যেখানে, আমরা শুনতে পাই যে, গল্পে নাকি জাদুবাস্তবতা হয়।

কেননা, আমাদের মনে পড়ে, শহীদুল জহিরের গল্প প্রসঙ্গে জাদুবাস্তবতার অভিযোগ ১৯৯৯ সালে, একটি দৈনিকের নির্বাচিত সৃজনশীল বই আলোচনা প্রসঙ্গে, আরও একজন গল্পকার উত্থাপন করেন। সেখানে দক্ষিণ আমেরিকায়, আমাদের পাঠ করতে হয়, প্রথমত দুটি উপন্যাস; দুটিই ১৯৪৯ সালে প্রকাশিত, 'জনারের মানুষ' এবং 'মর্ত্যের রাজত্ব', যথাক্রমে মিগেল আনহেল আস্তুরিয়াস ও আলেহো কার্পেন্তিয়ের-এর উপন্যাস; মজার ব্যাপার, দুটোই দুজনের দ্বিতীয় উপন্যাস; আমরা ধন্ধ লাগি যে, জাদুবাস্তবতা কি না! কিন্তু আমরা জানতে পারি যে, তাঁরা একে জাদুবাস্তবতা স্বীকার করেন না। আস্তুরিয়াস, ১৯৭২ সালে, রিটা গিবার্তাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেন, তাঁর রচনার নন্দনতাত্ত্বিক প্রস্থানভূমি হিসেবে যে, 'স্বপ্ন আর বাস্তবের মধ্যে সত্যি কোনও সীমারেখা নেই, কোনও ভেদরেখা নেই বাস্তবে আর কল্পনায়, যা চোখে দেখা যায় আর যা কল্পনায় গ'ড়ে নেওয়া যায়। আমাদের জল-হাওয়া-আলোর আবহটা এমনই কুহকে ঘেরা যে তা আমাদের গল্পগুলোকে একই সঙ্গে দুরকম ক'রে দিয়ে যায়—একদিক থেকে তাদের মনে হয় বুঝি-বা স্বপ্নই, অন্যদিকে তারা আবার বাস্তবই, বাস্তবের বিভিন্ন রূপ'। কার্পেন্তিয়ের, তাঁর গ্রন্থ-ভূমিকায় লিখেছেন, ১৯৪৩ সালে, লুই জ্যু-এর নাট্যদলের সঙ্গে হেইতি গিয়েই তিনি লাতিন আমেরিকার কুহকঘেরা বাস্তবতাকে আবিষ্কার করেছিলেন। কারণ লাতিন আমেরিকা হচ্ছে সেই পৃথিবী, যেখানে স্বপ্ন আর বাস্তবের সীমান্ত কেমন রহস্যসম্ভারে চিরস্থায়ীভাবে অস্পষ্ট হয়ে আছে। কেননা, সেখানে বাস্তব বিস্ময়কর আর বিস্ময়কর বাস্তব; সম্ভব-অসম্ভবের সীমানা যদি সেখানে থেকেও থাকে কোথাও, তবু তা চোখে পড়ে না। এঁরা দুজনেই, আমাদের উপলব্ধি যে, একটি বিষয় খোলাসা করেন নাই, সেটি হল—লাতিনীয় এই বাস্তবতার দুটি দিক; প্রথমত, বিশেষ অই অঞ্চলটিতে আজও বেঁচে আছে মায়া সভ্যতা-পুরাণ-কিংবদন্তি, এমনকি, মায়াদের সেই আশ্চর্য দিব্যপুস্তক—পোপোল বু; দ্বিতীয়ত, সামরিক একনায়কদের সুদীর্ঘ শাসন সেখানে মানুষকে কথা বলায় উপস্থাপনার ভিন্ন ভঙ্গিমায়।

অধিকন্তু আমাদের শুনতে বাসনা হয়, মার্কেজের কথা, তিনি মনে করেন জাদুবাস্তবতা আর বাস্তবতার জাদু অন্য কোথাও নয়—লুকিয়ে থাকে বলবার ধরনটাতেই। কলম্বিয়ার ঔপন্যাসিক প্লিনিও আপুলেইয়ো মেনদোসার সাথে

কথোপকথনে তিনি বলছেন এমনই এক কৃৎ-কৌশল-এর কথা–'একশো বছরের নিঃসঙ্গতা-ই হোক কিংবা আমার অন্য কোনও বই-ই হোক, আমার লেখার প্রতিটি পঙ্ক্তির যাত্রাভূমি নিখাদ বাস্তব থেকে। আমি শুধু একটি 'আতশ কাচ' দিই, যাতে পাঠক বাস্তবকে ভালোভাবে বুঝে নিতে পারে। একটা ছোট্ট উদাহরণ দিই, আপনাকে; 'সরলা এরিদিরা' গল্পে আমি দেখাই যে, উলিসেস কোনও কাচ ছুঁলেই তা অনবরত রং পালটে থাকে। এখন, এটা তো আর সত্যি সত্যি হয় না! কিন্তু প্রেম সম্পর্কে এত কথা আগেই বলা হয়েছে যে, এই ছেলেটি যে প্রেমে পড়েছে, এটা বলার জন্য আমাকে নতুন প্রকাশভঙ্গি উদ্ভাবন করে নিতে হয়েছিল। কাজেই আমি দেখাতে থাকি, কাচের রং পালটাচ্ছে আর তার মাকে দিয়ে বলাই, 'ওসব জিনিস হয় শুধু প্রেমে পড়লেই... মেয়েটি কে শুনি? যে-কথা অজস্রবার বলা হয়ে গেছে, প্রেম কেমন ক'রে জীবনকে, সবকিছুকে, ওলটপালট ক'রে দেয়–এটাই তো কথা, সে কথাই আমি বলতে চাইছি। শুধু আমার বলার ধরনটা অন্যরকম।'

এভাবে লাতিনীয় লেখকদের প্রসঙ্গ, আমাদের মনে হয় যে, শহীদুল জহিরের গল্প-বিষয়ে অধিক প্রাসঙ্গিক নয়; কেননা, লাতিনীয় জাদুবাস্তবতা ব'লেও কিছু নেই, আবার সে-ধরনের বিষয় জহিরের গল্পে প্রযুক্তও হয় না। এবং আমরা যখন এই মন্তব্য করি, তখনও আমাদের স্মরণে থাকে যে-একঝাঁক কাক দুজন নর-নারীকে ঠোঁটে ক'রে উড়িয়ে নিচ্ছে ঢাকা শহর থেকে নিরাপদ কোথাও; কিংবা একথাও মনে থাকে যে, আজিজ ব্যাপারির একই কুয়ায় সুবোধচন্দ্র ও তার স্ত্রী স্বপ্না নামের একাধিক ভাড়াটিয়া ডুবে মরে; শুধু তা-ই নয়, প্রত্যেক সুবোধচন্দ্রেরই ছোটভাই গ্রামে থাকে এবং প্রতিজনেরই নাম পরান– সে-কথাও আমরা বিস্মৃত হই না। কেননা, শহীদুল জহিরের গল্প তন্নতন্ন ক'রে পাঠ করলেও আমরা বাস্তবতার বাইরের কিছুই পাই না; যা পাই–তা আমারেদই আটপৌরে জীবন, সেই জীবন হয়তো সিরাজগঞ্জের কিংবা ভজহরি সাহা স্ট্রিট ভূতের গলি'র, বড়জোর চট্টগ্রামের একটি বা; কিন্তু তা আমাদের বাংলাদেশেরই, মুক্তিযুদ্ধের কিংবা নকশাল-বিষয়ে অথবা বিপন্ন এক সময়ের, পরাজিত এক জীবনের; যার যন্ত্রণাও সৌন্দর্যের ইন্দ্রজালে মহত্তম হয়ে ওঠে।

রুশ প্রকরণবাদে আছে যে, আমাদের পরিচিত বিষয়কে অপরিচিতকরণের মাধ্যমে উপস্থাপন করাই হ'ল শিল্প। আমাদের মনে হয় না যে, শহীদুল জহির শিল্প করার জন্য হা-পিত্যেশ করবেন। তিনি, তাঁর নিজ-জীবনের মতোই নির্লিপ্ত তাঁর গল্পেও। এইসব গল্পের পক্ষে বললেও তিনি তাঁর কাজ ক'রে যাবেন; বিপক্ষে বললেও থেমে থাকবেন না। আমাদের এরকমই মনে হয়। এই শহরের সাহিত্য-পাঠ-সম্পৃক্ততার সুবাদে সেই জগতের বহু রথী-মহারথীর দেখা হর-হামেশাই আমরা পেতে পারি; কিন্তু শহীদুল জহির? কাভি নেহি, তাঁর পদচারণা নেই আড্ডায় কিংবা ডামাডোলে। আমরা, দক্ষিণ মৈশুন্দি, ভূতের গলির লোকেরা; জোড়পুল ও পদ্মনিধি লেনের, ওয়ারি ও বনগ্রামের, নারিন্দা ও দয়াগঞ্জের মানুষেরা, আমাদের নিজেদেরই অতীত, বর্তমান কিংবা ভবিষ্যৎ

জীবনকেও পাঠ করি তাঁর গল্পে আর জীবনের সেই জটিলতার মধ্যে, সময়ের এক জটিল আবর্তের মধ্যে দাঁড়িয়ে দেখি যে, শহীদুল জহির কে? তাঁকে আমরা কোথাও দেখি না; এক ঘটমান চলচ্চিত্রের মধ্যে গল্পমন্ত্রে আমাদেরকে নানা ভূমিকায় দাঁড় করিয়ে দিয়ে তিনি ছায়া থেকে অদৃশ্য পর্যন্ত হয়ে যান; ঘটতে থাকি আমরাই, সংলাপও আমাদের, সেই চলচ্চিত্রে কোনও দিন অংশ নেন না তিনি। এখানেই গল্পকার হিসেবে তাঁর কৃতিত্ব। তাকে কীভাবে বলি উপাখ্যান-বলিয়ে কিংবা গল্প-কথক? যিনি গল্পলেখার সময় গল্পে অংশ নেন না, কটাক্ষ তো দূরের কথা, মন্তব্যও করেন না; তাঁর গল্পের পাত্রপাত্রীরা নিজেরাই কথা বলে নিজেদের সাথে, বর্ণনাও যা-কিছু–তা যেন ওই পাত্রপাত্রীরই, লেখক থাকেন গৌণ– প্যাসিভ; তিনি শুধু সূত্র ধরিয়ে দিয়ে নীরবে এক ফাঁকে সটকে পড়েন, গল্প এগিয়ে যায় নিজের তালে, নিজের তালেই শেষ হয়। তবে তিনি কী লেখেন, কেন লেখেন, সে-বিষয়ে আমাদের ধারণা হয় যে, তিনি বোধ করি একটা সূত্র রেখেছেন; আমরা, যারা তাঁর 'ডুমুরখেকো মানুষ ও অন্যান্য গল্প' গ্রন্থটি পাঠ করি, আমাদের হয়তো নজরে আসবে, উৎসর্গপত্রদ্বয়ের নামের নিচে তিনি উৎকীর্ণ করেন ছ'টি পঙ্ক্তি এবং আর তিনটি পঙ্ক্তি দ্বিতীয় ফ্ল্যাপে পাঠিয়ে দিয়ে, হয়তো-বা আমাদেরকে বিভ্রান্ত করার মজা নেন; কিন্তু আমরা বিভ্রান্ত হ'তে রাজি নই, কেননা, নয়টি পঙ্ক্তিই এইবার আমরা একত্রে পাঠ করব–

> মানুষেরা বলে,
> অতঃপর আমরা যার যার পথ হেঁটে গেছি অথবা যাব
> আমাদের মাঝখানে দাঁড়িয়েছে অথবা দাঁড়াবে সময় এবং নোনাপানি
> আমাদের মাঝখানে ক্রমাগত না দেখার দিন
> অতঃপর আমাদের সম্বল হয় কেবলই স্মৃতি
> আমাদের থাকে শুধু সোনালি রোদন।
> আমরা এখন এইসব লোকের
> কথা বলি; তাদের আনন্দ এবং বেদনার কথা বলি, তাদের
> অপরিণামদর্শিতার পরিণতির কথা বলি।

শহীদুল জহির, মানুষের কথা বলেন; বাংলাগল্পের এক অনন্যসাধারণ গদ্যশৈলীতে। আমাদের মনে পড়তে পারে, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর কথা, শহীদুল জহির বাক্য-কাঠামো নির্মাণে প্রাথমিকভাবে তার কাছে দীক্ষা নিলেও, জহিরের ভঙ্গিমা ওয়ালীউল্লাহ্ থেকে পৃথক। এই ভাষাভঙ্গিমা একান্তই তাঁর অর্জন। অন্যদিকে ভাষা-প্রয়োগের চেতনাগত বিন্যাসে তিনি আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের কাছে ঋণী, এই অর্থে যে, এঁরা দুজনেই মধ্যবিত্তের তৈরি কৃত্রিম ভাষা-ভড়ং বর্জন করেছেন এবং ভাষা ও সাহিত্যের আরোপিত কৌমার্য বা রুচিবোধের ভণ্ড-দেয়ালে শাবল চালিয়ে দিয়েছেন।

ইলিয়াস যেমন মধ্যবিত্তের সংস্কৃতি থেকে অবতরণ করে নিম্নকোটির মানুষের মধ্যে গিয়ে হাজির হয়েছেন, প্রচলিত সাহিত্যভাষা ত্যাগ করে স্ল্যাং, চলতি দেহাতি শব্দ, আঞ্চলিক বা শহুরে গলির শব্দ, গালিগালাজ, মুদ্রাদোষ সবকিছুর মিশ্রণে ভেঙে ফেলেছেন তথাকথিত আদর্শ-সাহিত্যিক ভাষা রুচি; আমাদের ধারণা যে, শহীদুল এই পথে দ্বিতীয় সার্থক যাত্রী। তাঁর, শহীদুল জহিরের, গল্প যে কার্যকর এবং প্রভাববিস্তারী, তা অচিরেই আমরা বুঝতে পারি; যখন দেখতে পাই, মুক্তিযুদ্ধের চিন্তাবীজে রচিত তার চারটি গল্প 'ইন্দুর বিলাই খেলা' (২০০২), 'প্রথম বয়ান' (২০০২), 'মহল্লায় বান্দর, আব্দুল হালিমের মা এবং আমরা' (২০০০), এবং 'মনোজগতের কাঁটা' (১৯৯৫)-এর কেন্দ্রীয় ভাব-প্রভাবিত হয়ে তাঁরই সমসময়ে একজন লেখক লিখে ফেলেন 'তালাশ' নামক ২৫৬ পৃষ্ঠার উপন্যাস। মুক্তিযুদ্ধ-বিষয়ক মৌলিক অংশের দিকে গভীর নজর ফেললেই, আমরা বুঝে ফেলব, যুদ্ধকালে ঢাকাবাসীর অভিগমন জিঞ্জিরা ও নবাবগঞ্জের দিকে কিংবা কেরানীগঞ্জের দিকে কীভাবে হয়; সেই বিষয় আমাদেরকে বেশিক্ষণ বিস্মিত রাখবে না; কেননা, আমরা একথাও জেনে ফেলব যে, যে-কোনও মহৎ-রচনার প্রমাণ এই যে, তা প্রভাবিত করার ক্ষমতা রাখে।

আমরা, এই রচনায়, জহিরের গল্পের কিছু মৌলিক প্রবণতা স্মরণ করতে চেষ্টা করব; কিন্তু তারও আগে আমাদের মনে পড়বে একটি গ্রাম্য-গল্পের কথা– একবার, এরকম শোনা যায় যে, এক দরিদ্র ভাগ্নে দুদিন অনাহারে থাকার পর অপেক্ষাকৃত ধনী মামার বাড়ি বেড়াতে যায়; সেখানে মামী তাকে শুধু ঝাল আলু-ভর্তা দিয়ে ভাত খেতে দিলে, ১২-১৪ বছরের বালকটি খুব ঝালকষ্টে ভোগে এবং সে টের পায় যে, পানির হাঁড়ির পেছনে দৈ-এর বাটি আছে; কিন্তু মামী তাকে শেষ পর্যন্ত দৈ খেতে না-দিলে, সে মামীকে একটা গল্প শোনায়। বালক বলে যে, মামাবাড়িতে আসার পথে ভয়ানক এক সাপ তাকে তাড়িয়ে ধরে, সে-সাপের গর্জন এই আলুভর্তার তেজের চেয়েও তেজি আর লম্বায় ঘরের দুয়ার থেকে হাঁড়ির পেছনের দৈ-এর বাটি পর্যন্ত–এত লম্বা সেই সাপ। এইখানে, গ্রাম্য-গল্পে, আমরা অনুমান করতে পারি যে, সাপ হয়তো একটা ছিল কিংবা আদৌ হয়তো ছিল, কিন্তু ঝাল-ভর্তার যন্ত্রণা এবং দৈ-বঞ্চিত হবার ক্ষোভসংক্রান্ত ইঙ্গিত দেবার তাগিদ ছিল না; তাই গর্জনের উপমা আর দৈর্ঘ্যের বর্ণনার মধ্য দিয়ে আমরা খুঁজে নিতে পারি বালকের বঞ্চনার ইতিবৃত্ত। গল্পে প্রয়োজন সেই ইঙ্গিত, যা থেকে আমরা জেনে নিতে পারি অবশিষ্ট গল্পগুলো। সৃজনশীল সাহিত্যকর্মও, আমাদের ক্ষুদ্রজ্ঞানে, হয়তো-বা এরকম ব'লেই মনে হয়। এই স্বাদ ও সাধটুকু পূরণ হয় ব'লেও আমরা শহীদুল জহিরের গল্প নিয়ে এত গল্প করি। আমাদের জীবনে প্রতিদিনই ঘ'টে যায় লক্ষ লক্ষ ঘটনা, আমরা বুঝতে পারি যে, তার সামান্যই কাহিনী ব'লে গণ্য হতে পারে; যেগুলো কাহিনী ব'লে গণ্য–তার মধ্যে দুয়েকটি হয়তো গল্প হয়ে উঠতে পারে, তা-ও যদি তেমন হাতে পড়ে; শহীদুল জহির তেমনই এক হাত, সেখানে ঘটনা কাহিনী অতিক্রম ক'রে পৌঁছে যায় গল্পের মর্যাদায়। সেই গল্পগুলো, আমরা বিবেচনা করি,

এমন যে, তা যেন সেইসব বিখ্যাত গজলের মতো; যেগুলো শুনলে মনে হয়–কত সহজ সুর, কিন্তু নিজেরা গাইতে গেলে বোঝা যায় কতই-না কঠিন!

আমরা, যারা ওজনদার সমালোচক নই, পাঠকমাত্র, তারা বুঝতে পারি যে, তিনি জীবনের গল্প করেন; কল্পনাও নয়, আখ্যানও নয়, নিরেট বাস্তব; আর বাস্তব বলেই হয়তো-বা তাঁকে এমন এক আড়াল তুলতে হয়, বিভ্রান্তির ইন্দ্রজাল তৈরি করতে হয়, যেন সেই বাস্তবতা মোকদ্দমার আরজি হয়ে না দাঁড়ায়, সাক্ষ্যমূল্য সৃষ্টি না হয়। আমরা লক্ষ করি যে, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ ও ভূতের গলির জীবন নিয়ে তিনি যে-গল্প করেন, ধরা যাক, 'মহল্লায় বান্দর, আব্দুল হালিমের মা এবং আমরা'–এই গল্পটির কথা, শহীদুল জহির, আমাদের ধারণা যে, বান্দরের ব্যাপারটা আনেন মুক্তিযুদ্ধের গল্পটাকে সফল করার জন্য; যেভাবে বালকটি সাপের ব্যাপারটা আনে। এবং এ-ধরনের গল্পতে স্থান-কাল-পাত্র এতই চেনা ও হাতের কাছের যে, তাঁকে বাহানা করতেই হয়, বাক্যেও তুলতে হয় বিভ্রান্তির ঘোরপ্যাঁচ; বলতে হয়, তখন, একদিন দয়াগঞ্জের রহিম জোড়পুলের আব্বাস কিংবা মৈশুন্দির আজিজের কাছে কিংবা অন্য কোনওভাবে আমরা জানতে পারি যে, হাজী আব্দুর রহিম আসলে পাকবাহিনীর সাথে মিলে যায়–এভাবে না-বলার বিকল্প কী হতে পারে, আমরা বুঝতে পারি না। আমরা শুধু এটুকুই বুঝতে পারি যে, এই গল্পগুলান অন্য সবার গল্পের চেয়ে আলাদা; এইগুলানের মধ্যে একধরনের চলচ্চিত্রগুণ আছে, সেই চলচ্চিত্র আমাদেরই সময়ের, আমাদেরই নাগরিক, এমনকি গ্রাম্যজীবনেরও; আমাদের যন্ত্রণার ও বিপন্নতার। সমগ্র বাংলাদেশের গল্পে শহীদুল জহিরকে পৃথকভাবে দেখবার ও বিবেচনা করবার কারণ আছে ব'লেও আমাদের মনে হতে থাকে। তাঁর 'ইন্দুর-বিলাই খেলা'র মধ্যেই আমাদের জীবন বরাবর আটকে আছে, সেকথাই আমরা সর্বাগ্রে বুঝতে পারি; কেননা, এমনকি, ছকে এঁকে দেখানো ইন্দুর ও বিলাইদের কালারও লক্ষণীয়; সেখানে ইন্দুর ধূসর, বিলাই কালো–এইসব গুটিকয় কালো বিলাই আমাদেরকে আজীবন ইন্দুর ডিক্লার করে, আমাদেরকে আজীবন লৌড়ায়; আর আমরা হালায় ভোন্দাই, মনে করি যে, শহীদুল জহির আমাদের সাথে মশকরা করে, আমাদেরকে বোকা বানায়, জাদুবাস্তবতা করে!

পুনরায় আমরা মনে করতে পারি, তাঁর গল্পের ইঙ্গিতময়তার কথা, 'কাঠুরে ও দাঁড়কাক' কিংবা 'মনোজগতের কাঁটা'র কথাও আমাদের স্মরণে আসতে পারে; আমরা 'মনোজগতের কাঁটা'র কথাই বলি, সেখানে আমাদের মনে হবে যে, আব্দুল আজিজ ব্যাপারির ভূতের গলির বাসায় যে-কালে, যত ভাড়াটিয়াই আসে সবার নাম সুবোধচন্দ্র, সবার বৌ-এর নাম স্বপ্না, সব সুবোধচন্দ্রেরই গ্রামে একটা ভাই থাকে, যার নাম পরান এবং সকল সুবোধ-স্বপ্নাই কুয়ায় ডুবে মরে; এইডা কেমুন কতা? তখন গল্পের পাত্রপাত্রীর মধ্য থেকেই– 'কয়েকজন একদিন আজিজ ব্যাপারিকে বলে, আপনের বাইতে আবার সুবোধচন্দ্র আইলো ভাড়াইট্টা হয়া!

আইলে কী করুম!

এই হালার বৌয়ের নামবি হালায় স্বপ্না ।

হঁ ।

অর ছুটো ভাইয়ের নাম জানেন?

না ।

পরান ।

তাই নিহি!

আপনের কুয়া তো অখনো রয়া গেছে গা, এই হালায় আবার না কুয়ায় পড়ে!

আরে না ।'

কিন্তু গল্পের এই সুবোধচন্দ্রের পরিণতিও একই । এখন আমরা বুঝতে পারি যে, শহীদুল জহির হয়তো ভবিষ্যৎ সময়ের গল্প লেখেন । তাই গল্পের দুয়েকটি বাক্য আমাদের কারও কারও স্মৃতিতে থাকতে পারে–'কোনো একদিন, তখন, কোদাল হাতে মাটি কেটে আব্দুল আজিজ ব্যাপারির বাড়ির ভেতরের পাতকুয়ো বন্ধ করতে গেলে তারা দেখতে পারে যে, তাদের জীবনের সময়ের কাঠামোটি ভেঙে পড়েছে, বর্তমান অতীতের ভেতর প্রবিষ্ট হয়ে গেছে অথবা অতীত, ভবিষ্যত-বর্তমানের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে । এই বিভ্রান্তির ভেতর তারা সেদিন মাটি কেটে কুয়ো ভরাট করার কাজ করে, কারণ, তা না করলে, তাদের এরকম ধারণা হয় যে, আব্দুল আজিজ ব্যাপারির নতুন ভাড়াটে সুবোধচন্দ্র অতীতে, বর্তমানে অথবা ভবিষ্যতে এই কুয়োর ভেতরে পড়ে যাবে ।' এমনকি, লক্ষ করা যাচ্ছে, 'ভবিষ্যত-বর্তমান' এরকম একটি শব্দ বা সময়কালকে কল্পনা করা হয়েছে; তো, আমরা যদি ধ'রে নিই যে, কুয়োটি র‍্যাব এবং সবাই, যারা সুবোধচন্দ্র, সেই কুয়োতে প'ড়ে (মৃত্যুর ধরনটি) মরে যাচ্ছে–অর্থাৎ ক্রস-ফায়ারে; এই কথাটি সাহিত্যে তিনি বলবেন কীভাবে? নিশ্চয় এরকম গল্পের মধ্যেই বলবেন! সবাই র‍্যাবের ক্রস-ফায়ার ফর্মুলায় মরছে– এমন বললে তো সংবাদ-প্রতিবেদন হবে! আজিজ ব্যাপারির ভাড়াটিয়া না হয়ে আমরা তো ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইলের ভাড়াটে হতে পারি, যাদের এমন একটা শ্রেণী আছে, যে, পরিণতি কমবেশি একই! তাদের আর নাম পৃথক হয়ে লাভ কী? এই অংশে আমাদের পুনরায় আরেক কথা মনে পড়ে, তখন আমরা বাগেরহাটে থাকি; একদিন পড়ন্ত বিকেলে, 'ভোরের কাগজে' পড়ি যে, ঢাকা-লালমনিরহাটগামী একটি বাস খাদে পড়ে ৫ জন মফিজ নিহত এবং ১৮ জন মফিজ আহত হয়েছে; ঐ সংবাদে আমরা আরও জানতে পারি যে, বাসে মোট ৪২ জন মফিজ ছিল; এতে সহসাই আমাদের মনে পড়ে লাতিন আমেরিকার কথা– 'ভোরের কাগজও' কি আমাদের সাথে ম্যাজিক-রিয়ালিটি করে? আমাদের সেই বিভ্রান্তি ভাঙে তখনই, যখন আমরা শুনতে পাই, ঐ বাসে যে-কোনও যাত্রীকেই মফিজ নামে ডাকা হয় । যারা যখনই ঐ বাসের যাত্রী হবে, তাদেরই সাধারণ নাম মফিজ ।

শহীদুল জহিরের গল্পের কথা ভাবলেই আমাদের নানা কথা স্মরণে আসে, যেমন এই মুহূর্তে স্মরণ হয় 'চতুর্থ মাত্রা' গল্পটির কথা সেটির চলচ্চিত্রায়ণ হয়েছে মর্মেও আমাদের জানা থাকতে পারে; কিন্তু তখনই আমরা যুগপৎ বিভ্রান্ত ও বিচলিত হয়ে পড়ি, এই ভেবে যে, চলচ্চিত্রায়ণ তো গল্পেই ঘটে আছে! ক্যামেরার কি এরও চেয়ে 'মোশন' হতে পারে? শিল্প-নির্দেশনা, দৃশ্য-দৃশ্যান্তরের খুঁটিনাটিও ওই গল্পের শরীরেই সুমুদ্রিত আছে; এ এক বিস্ময়কর ব্যাপার ও গল্প-আঙ্গিক, যা, আমাদের মনে হয়ে যে, আমরা ইতোপূর্বে কোথাও হয়তো লক্ষ না ক'রেই থাকব। সেই গল্পের যান্ত্রিক-নিঃসঙ্গ জীবনের এক আব্দুল করিম ও তার পরিপার্শ্বের চলচ্চিত্র আমাদেরকে বুঝিয়ে দেয় যে, কটাক্ষ করবার জন্য সমাজ ও রাষ্ট্রের অসঙ্গতি অন্বেষণেরও কোনও প্রয়োজন নেই; আমাদের জীবন স্বয়ং যেন ব্যঙ্গাত্মক হয়ে আছে এখানে। এ-ধরনের একটি শাদামাঠা আটপৌরে ও গৎবাঁধা জীবনের অনুল্লেখ্য বিষয়ও যে গল্প হয়ে উঠতে পারে, তা, আমাদের মনে হয় যে, এই প্রথম আমরা উপলব্ধি করি। কিংবা আমাদের মনে পড়তে পারে, একটিমাত্র অনুচ্ছেদে, মুদ্রিত এক ফর্মা আয়তনের গল্পটির কথা; যাকে, তিনি, শহীদুল জহির, নামায়ন করেন 'আমাদের কুটির শিল্পের ইতিহাস'; গল্পটি শেষ হয়েছে কোনও পূর্ণ যতিচিহ্ন ছাড়াই। এক তরমুজের বাহানার মধ্য দিয়েই শহীদুল জহির আমাদের জীবনের নিগূঢ় ব্যঞ্জনার মধ্য দিয়ে দিয়ে যেতে থাকেন বোধ ও আনন্দের, সৌন্দর্য ও বিপন্নতার অমেয় ভুবনে।

রচনার এই পর্যায়ে এসে, আমাদের শোচনা হয় যে, শুরুতে মাছ ও জল এবং তার স্তরবিন্যাসের যা-কিছু ইঙ্গিত করেছি, সে-বিষয়ে হয়তো কিছুই বলা হল না; আমাদের এ-ও মনে হয় যে, সে-বিষয়ে অধিক বলার নেই– শুধু এটুকুই বলা যেতে পারে, প্রথম স্তরের পাঠ নিলে কিংবা শ্রুতি নিলে মনে হবে যে, শহীদুল জহির বোধ করি, জাদুবাস্তবতা করেন, মার্কেজ হয়ে ওঠেন; সেটি ভুলপাঠ হবে, ভুল জানা-ও। জলের দ্বিতীয় স্তরে বিচরণ করলে মনে হবে যে, তাঁর গল্প আমাদেরই বিপন্ন সময় ও জীবনাবাস্তবতার এক সুরতহাল শুধু নয়, ময়নাতদন্তও; যে-গল্পগুলোর জন্য আমাদের যন্ত্রণা ও বিস্ময়বোধ সক্রিয় থাকে অনিবার্য অস্তিত্বের ছায়াসঙ্গী হয়ে। শেষ নয়, তৃতীয় স্তরে বিচরণশীল হ'লে জানা যাবে, এমন এক শিল্পের উদ্ভাসনমুগ্ধ জগৎ যে, আমাদের নিঃসন্দেহে মনে হয়, এক শতাব্দীর ছোটগল্পের ইতিহাসে, নন্দনতত্ত্বের সকল বিবেচনায়, আমরা তাঁর জন্য, সেই শিল্পী শহীদুল জহিরের জন্য গর্বিত মনে করতে পারব নিজেদের।

কিন্তু সবকিছুর পরেও, এই ক্ষুদ্র রচনায় এক ব্যক্তি রহমান হেনরী যখন বারবার 'আমরা' 'আমরা' করতে থাকে, তখন, পুনরায় আমরা এক জটিলতার ঘূর্ণাবর্তে ঢুকে যাই এবং বিভ্রান্ত বোধ করি; ভাবি যে, এই হালায় মনে হয়, রচনার এইখানেও জাদুবাস্তবতা শুরু করে, একজন আবার আমরা হয় কী করে? সেই বিষয়টাও একটু খোলাসা হওয়া দরকার। আমরা তো সর্বনাম, তার সংজ্ঞা থাকা যুক্তিসঙ্গত; যুক্তি-

বিচারে না মিললেই তো ফের ম্যাজিক-রিয়ালিটি! তো, আমরা বলতে, আমি, এইখানে অন্তত ১৬ জন পাঠকের কথা বলি, যারা ৫টি পৃথক পরিবারে বেড়ে ওঠা; যাদের ২টি পরিবার অন্তত ২৫ বছর পুরনো ঢাকায় বাস করেন। অবশিষ্টগণ গ্রাম্যজন। শহীদুল জহিরের দুটি গল্পগ্রন্থ যাঁরা সকলেই পাঠ করেছেন এবং যাঁদের পাঠাভিজ্ঞতার মিথস্ক্রিয়ায় প্রাপ্ত ধারণাই এই রচনায় যথাসাধ্য তুলে ধরা হল ব'লে, আমাদের মনে হ'তে থাকে। শহীদুল জহির আমাদের সামনে আমাদেরই জীবনের যে-গোপন আয়নাটি দাঁড় করান, আমরা বিশ্বাস করি যে, তা আমাদের বাস্তবতার শিরা-উপশিরা-ছেঁড়া ফিনকি-ছোটা রক্তের স্রোত বইয়ে দেয়; আর আমরা সেই রক্তজলের বাস্তবতায় বিমুগ্ধ স্নান করতে করতে দীর্ঘায়ু কামনা করি গল্পের, আর সেই জাদুকরের, যিনি কোনও জাদু দেখাতে চান না কিন্তু যা জাদুর মতো দেখায়।

অ নু বা দ ক বি তা

মূ ল লো র না দে সে র ভা ন্তে স

....
অনুবাদ শামস আল মমীন

[লোরনা দে সেরভান্তেস-এর জন্ম [১৯৫৪–] সানফ্রান্সিস্কো শহরে। সমকালীন মার্কিন কবিতায় তাঁর স্থান অত্যন্ত উঁচুতে। কবিতা লেখার পাশপাশি বহু সমাজকল্যান সংগঠনের কাজে যুক্ত। তিনি কলোরডো বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন।]

বড় রাস্তার ছায়াতলে **(দুই)**
আমাদের নারীসর্ব পরিবার: দাদী
একেবারে সাদাসিধা আমাদের রানী;
মা, ক্ষিপ্র নাইট, দুঃসাহসী যোদ্ধা।
মা বরং শাহ্‌জাদী হতেই চেয়েছিলেন। আমি জানি,

আজও তিনি স্বপ্ন দ্যাখেন মাথায় এক ফুট উঁচু
তাজ আর মনোহর রেশমী কাপড় ।
আমি নিজেঃ কোনোকালে মনস্থির করতে পারিনি ।

তাই ঝুঁকে পড়ি বইয়ের মাঝে, একরোখা পুরুষের ভিড়ে ।
হলাম কেরানিঃ ভিনদেশ থেকে আসা
চিঠির অনুবাদক, বিবাহ বিচ্ছেদ, সরকারী

চিঠিপত্র আর কল্যান ভাতার শর্ত ব্যাখ্যাকারী ।
পাওনাদারের টাকা শোধ করি, ছেলেদের
কাজে এক-আধটু সাহায্য, কলকব্জা মেরামত,
আর ক্ষয়ে যাওয়া ফুটাফাটা থেকে সবকিছু
নিরাপদে রাখি ।

বড় রাস্তার ছায়াতলে **(ছয়)**

"তুমি একেবারে বোকা...এবং সবসময় তাই
ছিলে । কিচ্ছু হবে না তোমাকে
দিয়ে । শোন, কারও ওপর কখনো ভরসা কর না ।"

–উদ্বিগ্ন মায়ের উপদেশ ।
বোকা । আমি এতটুকু বদলাইনি, হয়তো আমি
খুব বেশি শান্ত অথবা আমাকে বিষন্ন দেখায় ।

"শোন মা, আমার ভেতরের সবকিছু
আমি ধুয়ে মুছে নিতে পারি । সত্যিই পারি ।"

"কিন্তু মা, ওদের প্রতি যদি তুমি মহত্ব দেখাও
ওরাও তোমাকে তা ফেরত দেবে ।"

ফেরত । রাস্তার ওপারে প্রসস্থ রাস্তা ।
এখন গরমকাল । আমার প্রতিটি রাত কাটে
একটা সুবোধ মানুষের মিথ্যা অভিনয় দেখে,
এবং সময়মতো রুয়ে দেই ফলোৎপাদী চারা ।
আমি ঢিলা করে বেণী বাঁধি চুলে আর
শুধু আস্থা রাখি যা আমার হাতে গড়া ।

ব ই আ লো চ না

চ ঞ্চ ল আ শ রা ফ

বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ কবিতা! : শত্রু ও আত্মীয় চেনার সংকলন

বই	:	বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ কবিতা
সম্পাদক	:	রণজিৎ দাশ ও সাজ্জাদ শরিফ
প্রকাশনী	:	সপ্তর্ষি প্রকাশন, কোলকাতা
প্রকাশকাল	:	২১ ফেব্রুয়ারি ২০০৯
পৃষ্ঠাসংখ্যা	:	৩৮৮

যে-কোনো নির্বাচিত বা শ্রেষ্ঠ রচনার সংকলন করাই ঝুঁকিপূর্ণ। সাহিত্য জগতের সেই ঝুঁকিপূর্ণ কাজটিই করেছেন সাজ্জাদ শরিফ ও রণজিৎ দাশ। সেজন্য তাঁদের ধন্যবাদই পাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু প্রশ্ন হল ঝুঁকির কাজ যদি এমনভাবে করা হয় যাতে ঝুঁকি আরও বহুগুণ বেড়ে যেতে পারে, তাহলে সেই ঝুঁকি মোকাবেলা করার ক্ষমতা অনেক সময় উদ্যোক্তাদের না-ও থাকতে পারে। সঙ্গত কারণেই ‘বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ কবিতা’ নামক সংকলনের সম্পাদকদ্বয়ের প্রতি প্রশ্ন জাগে, আপনারা কি সেই ঝুঁকি মোকাবেলা করার সামর্থ্য রাখেন? যিনি বা যারা আমাদের গালি দেন তাদের বিরুদ্ধে আমরা প্রতিবাদ জানাই লিখে, যারা মারেন-কাটেন হত্যা করেন তাদের বিরুদ্ধেও লিখেই প্রতিবাদ করি। আর এই সম্পাদকদ্বয় শ্রেষ্ঠ কবিতার সংকলন করেছেন, ব্যাপক পাঠকের কাছে গ্রহণীয় অনেককেই অস্বীকার করেছেন ছাপার বইয়ের মাধ্যমে– সেখানে কি লিখিত উপায় ছাড়া অন্য কোনো উপায়ে প্রতিবাদ সাজে? যাদের কবিতা এখানে নেই শুধু তারাই নয়, বরং এই সংকলনে যাদের কবিতা আছে তাদেরও সংকলনটির বৈধতা ও গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে সন্দিহান হওয়া স্বাভাবিক। এই জন্য যে, যে সকল কবিরা দীর্ঘ সময় বহু ভালো কবিতা লিখে লিখে পাঠক-হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছেন সেই সকল কবির কবিতা বাদ দেয়ার ধৃষ্টতা তো অন্য দেশের মানুষ একজন রণজিৎ দাশ-এর থাকার কথা নয়! সাজ্জাদ শরিফও এই সংকলন কেন ও কী চিন্তার ভিত্তিতে করলেন সেটা অনেকের কাছে বোধগম্য নয়। কারণ পরীক্ষিত মানসম্পন্ন অনেক

কবিদের কবিতা যেমন এখানে নেই একইভাবে বহু অকবির কবিতা এখানে ঠাঁই পেয়েছে, হয়তো ব্যক্তিগত সুসম্পর্ক বা অন্য কোনো হিসেব-নিকেশ থেকে। উদ্দেশ্য যদি হয় এই যে, পশ্চিমবঙ্গের পাঠকদের কাছে বাংলাদেশের কবিতা সম্পর্কে ধারণা দিতেই এই সংকলন– তাহলেও প্রশ্ন জাগে, পশ্চিমবঙ্গের পাঠকরা আদৌ কি আমাদের কবিতা সম্পর্কে সঠিক চিত্র পাবেন? ওখানকার প্রচারমাধ্যমগুলোর তো বাংলাদেশের সাহিত্যিকদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধও নেই। থাকলে সেখানকার পত্রপত্রিকায় শামসুর রাহমানের নাম সামসুর বা সামশুর রহমান মুদ্রিত হত না! পশ্চিমবঙ্গের পাঠকদের প্রতি এত দরদ হঠাৎ করেই উথলে ওঠার মূলেও রয়েছে দুষ্ট রাজনীতি। একদিকে বাংলাদেশের সাহিত্যের ওপর অভিভাবকত্ব ফলানো; অন্যদিকে দেখিয়ে দেয়া– কলকাতার প্রকাশক ছাড়া এখানকার পাঠকদের কাছে ওদের সাহিত্য পৌঁছে দেয়ার কোনও উপায় নেই! দ্বিতীয়ত, ওরা কী লেখে এবং সে-সব কত নিকৃষ্ট আর অশিল্পিত, তা ওখানকার পাঠকদের বুঝিয়ে দেয়া। তৃতীয়ত, ঢাকায় এসে সাহিত্য সমাজে আগের চেয়ে বেশি কল্কে নেয়ার ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করা। সাজ্জাদ শরিফ কলকাতায় গিয়ে কল্কে সে-রকম নিতে পারবেন কি-না জানি না; তবে দু'টি বিষয়ে তিনি সফল হয়েছেন। প্রথমটি হল বহু দিন কবিতা না-লিখেও ঢাকার সাহিত্য সমাজে নিজেকে বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে জাহির করতে পেরেছেন। তিনি যাঁদের সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন, এখন থেকে তাঁরা নতুন করে আরও কিছুকাল ধরে তাঁকে তোষামোদও করতে পারবেন! সঙ্কলনটি প্রকাশের পর হয়তো অনেকেরই বুক হাহাকারে ভেঙে পড়েছে যে, কেন তাঁরা সাজ্জাদ শরিফের কাছে নিয়মিত সহাস্য হাজিরা দিতে পারেননি। দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ কবিদের মধ্যে নির্লজ্জভাবে তিনি নিজেও একজন; শুধু তা-ই নয়, শ্রেষ্ঠদের মধ্যে যাঁরা অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ, তিনি তাঁদেরও একজন। তাঁর প্রতিভা প্রশ্নোর্ধ্ব; কিন্তু তাঁর উদারতার সীমা নেই। নিজের সব ক'টি কবিতা সঙ্কলনে রাখা তাঁর পক্ষে যে সম্ভব হয়নি, অন্তত সেকারণে বাঙালি তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে!

দুই

রণজিৎ দাশ পশ্চিম বাংলার প্রতিনিধিত্ব-স্থানীয় কেউ নন। না সাহিত্যে না অন্য কিছুতে। তার ব্যক্তিগত কোনো কাজের কারণে পুরো পশ্চিম বাংলার নিন্দা করা বেমানান। বরং অম্লান দত্ত, শঙ্খ ঘোষ, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, জ্যোতি বসু বা বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য প্রমুখ ব্যক্তি– পশ্চিমবঙ্গ চালাচ্ছেন যাঁরা বাংলাদেশেরই মানুষ। তারপরও ওখানকার কোনো কোনো কাজ আমাদের মনে সন্দেহ তৈরির কারণ সৃষ্টি করে।

তসলিমা নাসরিনের পর যখন শামসুর রাহমানকে আনন্দ পুরস্কার দেয়া হয়, সেটি গ্রহণে তাঁর কোনও আপত্তি ছিল না। আপত্তি না করার বিষয়টি তাঁর নিজস্ব হলেও এতে ধরে নেয়া যায়, ওই পুরস্কার প্রাপ্তির ব্যাপারে শামসুর রাহমান অন্তত তসলিমার চেয়ে

অগ্রগণ্য নন। পশ্চিমবঙ্গের ওই প্রতিষ্ঠান বাংলা একাডেমীকেও পুরস্কৃত করেছিল। এটা ছিল দাদাগিরির চরমতম প্রকাশ ও ধৃষ্টতা; আহমদ ছফা ও হুমায়ুন আজাদ ছাড়া আর কেউ এর বিরুদ্ধে তেমন সরব হননি। এই নীরবতা প্রমাণ করে যে, ভারতের বাঙালি অধ্যুষিত ওই প্রদেশটির বাংলাদেশের প্রতি বিশেষ এক মনোভাব রয়েছে, যা আমাদের জন্যে সম্মানজনক নয়। এটিই সাম্রাজ্যবাদের আসল চেহারা! একটি প্রতিষ্ঠান যখন কাউকে পুরস্কৃত করে, তখন এটিই সত্য হয়ে দেখা দেয় যে, ওই প্রতিষ্ঠানের কাছে সেই সময় পুরস্কৃত ব্যক্তিটিই শ্রেষ্ঠতম। অর্থাৎ তসলিমা নাসরিনকে পুরস্কৃত করার মানে তা হলে দাঁড়ায় এই, ওই সময় এদেশে তাঁর চেয়ে ভালো কেউ কিছু লিখতে পারেন নি। এটিই কুচক্রীদের রাজনীতি: প্রতিপক্ষ সম্পর্কে এমন একটি ধারণা সৃষ্টি করা, যার লক্ষ্য সেই জাতির মনস্তত্ত্ব ও মূল্যবোধ ভেঙে দেওয়া। ফলে, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস যখন আনন্দ পুরস্কার পান ও গ্রহণ করেন, তখন বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা থাকে না যে, মূল্যবোধ সত্যি-সত্যি ভেঙে পড়ছে। প্রদেশটির একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান তাদের রাজনীতি নিয়ে এদেশের সংস্কৃতির ওপর ছড়ি ঘোরানোর কাজে সফল হতে চলেছে! এখন দেখছি, তার দেখাদেখি সেই কর্মে উদ্যোগী হয়ে উঠছে অন্যরাও! আলোচ্য সংকলনটি সেই বদমায়েশিরই ধারাবাহিকতা।

আলোচনার স্বার্থে উল্লেখ্য যে, ২০০৯-র ২১ ফেব্রুয়ারি *বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ কবিতা* নামে বাংলাদেশের কবিতার এই সঙ্কলন বেরিয়েছে কলকাতার সপ্তর্ষি প্রকাশন থেকে। যৌথভাবে এটি সম্পাদনা করেছেন 'পশ্চিমবঙ্গের কবি' রণজিৎ দাশ এবং 'ঢাকার কবি' সাজ্জাদ শরিফ। জসীমউদ্‌দীন থেকে শুরু করে তরুণতর পর্যন্ত বাংলাদেশের ৬০ জন কবির ৩৮৬টি কবিতা এতে স্থান পেয়েছে। প্রকাশের পর থেকে ৩৮৮ পৃষ্ঠার এ-সঙ্কলনের সম্পাদনার মান, দৃষ্টিভঙ্গি, বিশ্বস্ততা, গ্রহণযোগ্যতা ইত্যাদি নিয়ে অনেক প্রশ্ন উঠেছে; লিখিত ও মৌখিক আলোচনাও কম হয়নি। সে-সব প্রসঙ্গে কিছু বলার আগে, এই সংকলন প্রকাশের পেছনে কী রাজনীতি কাজ করেছে তা বলা জরুরি মনে করছি। রাজনীতিটি বেশ পুরনো এবং সবাই কম-বেশি তা বোঝেন। তবু সাহিত্যে প্রভুত্ব ফলানোর সূত্রগুলো কীভাবে সংকলনটি ধারণ করেছে, তা পরিষ্কার হওয়ার জন্যে আরও কিছু কথা বলা দরকার।

বইটি বেরিয়েছে ভারতের একটি প্রদেশ পশ্চিমবঙ্গ থেকে। প্রতিবেশি একটি রাষ্ট্রের 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' প্রকাশের দায়িত্ব প্রদেশটির এক প্রকাশক বেশ উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে পালন করেছেন, বিষয়টি বেশ সন্দেহজনক। আর সেখানকার কবি রণজিৎ দাশ বইটির পরিকল্পনা ও সম্পাদনার কাজটি করলেন, এটাও সন্দেহের ঊর্ধ্বে হতে পারে না। ঊর্ধ্বে থাকার জন্যে ভূমিকায় সংকলনটি প্রকাশের একটা উদ্দেশ্যের কথা বলা হয়েছে। সেটি হল পশ্চিমবঙ্গে বাংলাদেশের কবিতার নির্ভরযোগ্য কোনও সংকলন নেই, সেখানকার পাঠকদের এদেশের কবিতা সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা দিতেই সংকলনটি প্রকাশ করা হয়েছে। যত 'মহৎ' হোক, এই উদ্দেশ্য প্রচারের আড়ালে যে কূট

রাজনীতিটি রয়েছে তা সামান্য বুদ্ধি থাকলে যে-কারও পক্ষে বোঝা কঠিন নয়। রাজনীতিটি খুবই ধৃষ্টতাপূর্ণ : একটি রাষ্ট্রের সাহিত্যের ওপর ছড়ি ঘোরানোর এই চেষ্টা একটা প্রদেশ কেন, কোনও রাষ্ট্রের কোনও ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠান করতে পারে না। কিন্তু এটি করার কারণ কী? কারণ হীনম্মন্যতা; প্রাদেশিক হীনম্মন্যতা: সম্ভবত তাদের মনে এই বিষয়টি বড়ই বেদনার যে বাংলা সাহিত্য বাংলাদেশের জাতীয় সাহিত্য; আর পশ্চিমবঙ্গের বাংলা সাহিত্যের সেটা হওয়ার সুযোগ নেই। এই বেদনার ভাষা হল— বাংলাদেশের সাহিত্যের ওপর দাদাগিরি ফলানো, এটা সানন্দে যারা মেনে নেয় তাদের সার্টিফিকেট দেয়া, কখনও-কখনও এদেশের সাহিত্যের প্রতি উপেক্ষা ও তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করা। দীর্ঘদিন তারা এই দাদাগিরি করে আসছে। এক্ষেত্রে আমাদের দায়িত্বও যেন কম নয়; আমরা অপেক্ষায় থাকি কখন কোন দাদা আসবেন। এলে তার জন্যে আমরা পাগল হয়ে যাই; যেন সড়কগুলোতে তোরণ নির্মাণ করতে পারলে তবেই আমরা পুরোপুরি ধন্য হতে পারি!

বাংলা সাহিত্যের অভিভাবকের ভাব ধরায় আমরা ভাবি যে, তাদের 'দাদা-দাদা' করতে পারলে সাহিত্যিক হিসেবে জাতে ওঠার বা উভয় 'বঙ্গ'র সাহিত্যসমাজে কল্কে পাওয়ার একটা ব্যবস্থা হয়ে যায়। এই ব্যবস্থা বহু আগে থেকেই রয়েছে। তার পটভূমি খুব মর্মান্তিক। ব্রিটিশদের কাছে কলকাতা ঢাকার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্ব পাওয়ায় শিক্ষা-বাণিজ্যসহ নগরায়নের সব ক্ষেত্রে প্রসার ঘটার ফলে সেখানকার মানুষের মধ্যে অহমিকার সংক্রমণ ঘটে। এই অহমিকার শিকার পূর্ববঙ্গের মানুষ। যার প্রমাণ বুদ্ধদেব বসু, যথেষ্ট মেধাবী হওয়া সত্ত্বেও শুরুর দিকে তিনি কলকাতায় নিগৃহীত হয়েছিলেন। এর কারণ দু'টি। একটি হল তিনি পূর্ববঙ্গের মানুষ, অন্যটি তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে দীর্ঘদিন কোনও মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণ্য করেনি। হুমায়ুন কবীর মুসলমান বলে তাঁর রচনা এখনও কলকাতায় অন্তরালেই রাখা হয়। নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের একটা কৌশল হল অন্যদের অবজ্ঞা করা; দীর্ঘকাল এই চর্চা চলতে থাকলে একটা মনস্তাত্ত্বিক চাপ তৈরি হয় উপেক্ষিতদের ওপর; এই চাপ সামলাতে না-পেরে এদেরই একটা অংশ দালাল ও চাটুকার হয়ে ওঠে। এরাই ব্যবহৃত হয় 'প্রভুদের' দ্বারা; নিজেরা বেশ ভালো

করেই জানে যে তারা ব্যবহৃত হচ্ছে; কিন্তু সাহিত্যসমাজে ক্ষমতা ও প্রতিভার বড়াই করতে গেলে জ্ঞান ও কাণ্ডজ্ঞান, বোধ ও বুদ্ধি, ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদা— এসব নিয়ে ভাবলে এদের চলে না। আমাদের 'ঢাকার কবি' উজাড় করে দিয়েছেন নিজের প্রতিভার পুরোটাই। পশ্চিমবঙ্গের নিতান্ত এক কবির একটা টোকাতেই তাঁর এই লুটিয়ে পড়া? সাজ্জাদ সাহেব আমাদের স্বজন বিধায় আমরাও এতে লজ্জা পাচ্ছি, আর তিনি এতই সহিষ্ণু? বিকারহীন? হলেন কিভাবে? আমাদের মতে 'বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ কবিতা' প্রকাশিত হবে বাংলাদেশ থেকেই, ভিনদেশ থেকে নয়। সে বইয়ের প্রকাশকও হবেন

বাংলাদেশী। সম্পাদনা করবেন এক বা একাধিক বাংলাদেশী। কিন্তু জনাব সাজ্জাদ এতটা আত্মবিক্রির খেলায় মেতে উঠলেন কোন বুদ্ধিতে!

সাহিত্যের তো কোনও ভূখণ্ড নেই; কখনও তা থাকতে নেই। সাহিত্য হল সাহিত্য, যেমন বাংলা সাহিত্য হল বাংলা সাহিত্য– যেখানেই তা রচিত হোক না কেন। অথচ নাক-উঁচু প্রভুত্বকামী 'দাদা'দের কর্মকাণ্ড থেকে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, সাহিত্য হল কূট রাজনীতি; তার ভূখণ্ড নির্দিষ্ট, তাতে উঁচু-নীচু আছে; মালিকানা আছে, জায়গির প্রথাটিও আছে! সাহিত্য যে কূট রাজনীতি, প্রত্যয়টি কলকাতারই সৃষ্টি; এটা তারা করেছে নিজেদের নিরাপত্তাহীনতা থেকে। এমনিতেই ওখানে বাংলা ভাষার অস্তিত্ব বিপন্ন; 'দেশ'-এর মতো দাপুটে একটা পত্রিকা সাপ্তাহিক থেকে পাক্ষিক হয়ে গেছে কেবল বাংলাদেশে প্রবেশের ক্ষেত্রে সেন্সরশিপের প্রক্রিয়াগত কারণে। ওদের বইয়ের বাজার বাংলাদেশ; এখানকার পাঠকদের টাকায় পশ্চিমবঙ্গের প্রধান প্রকাশনাগুলো টিকে আছে। ওদের বই না-পড়লে আমাদের চলে না– এই মনস্তত্ত্বও দাদাগিরির প্রধান একটা কারণ। তারা চায় মনস্তত্ত্বটি অটুট থাকুক এবং তা যাতে থাকে সেজন্যে এখানে একটা সুদূরপ্রসারী কার্যক্রম তাদের জন্যে জরুরি। আলোচ্য সংকলনের ফল হল, এখানকার বাজে রচনাগুলোকে সাহিত্যের মর্যাদা দিয়ে তারা বোঝাতে চায় যে এটাই দেশটির সাহিত্য, এর চেয়ে ভালো কিছু এখানে সৃষ্টি হয় না। এতে দুটি কাজ এক সঙ্গে হয়ে যায় : নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন বজায় রাখার ক্ষেত্রে কোনো বাধাই থাকে না এবং মান হিসেবে তা টিকে থাকলে দাদাগিরিটাও টিকে যায় আর ব্যবসাটা নিরাপদে ও ভালোমতো করা যায়। তারচেয়ে বড় কাজ, বাংলাদেশের পাঠক-লেখকদের সাব-স্ট্যান্ডার্ড বানিয়ে রাখা সম্ভব হয়। অবশ্য কিছু সাব-স্ট্যান্ডার্ড লেখক ওরা আমাদের জন্যেও রেখেছে। এদের বইয়ের বড় বাজার যে বাংলাদেশ, তা নিয়ে কলকাতার খাঁটি বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে বেশ হাসাহাসি হয় বলে শুনেছি।

লক্ষণীয়, সংকলনের দুই সম্পাদককে উল্লেখ করা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের কবি ও ঢাকার কবি বলে; অর্থাৎ তাঁরা ভারতের ও বাংলাদেশের নন। এটা চমৎকার কপটতা এবং এতেও রয়েছে কূট রাজনীতি : এক ধরনের সমতা প্রদর্শনের আড়ালে রণজিৎ দাশ ও সাজ্জাদ শরিফের মধ্যে গুরুতর রাজনৈতিক পার্থক্যটি টের পাইয়ে দেয়া হয়েছে। পার্থক্য আছে অবশ্যই, থাকাটা অপরাধ নয়। কিন্তু ভারতের কবি বলে উল্লেখ না করতে পারলে বাংলাদেশের কবি বলা যাবে না, এই মানসিকতা সুস্থতার পরিচয় দেয় না। অধিকন্তু একটা সুবিধা নেয়ার হীনতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সেটি হল, পশ্চিমবঙ্গ ঢাকার মতো ছোট নয়; পশ্চিমবঙ্গের কবি ঢাকার কবির মতো নয় ছোট! কথাটা যত ইনডাক্টিভ লাগুক, শুনতে যত বালখিল্য মনে হোক, এদেশের কবির প্রতি তাদের এই তাচ্ছিল্য খুব পরিকল্পিত। বসবাস ও কর্মসূত্রে সাজ্জাদ শরিফ যদি পাবনার লোক হতেন তা হলে কি তিনি পাবনার কবি হতেন?

তিন

এই সঙ্কলনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের কবিতা সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গের পাঠকদের যে 'পূর্ণাঙ্গ' ধারণা দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে, তা একদিকে আমাদের সাহিত্যের জন্যে আত্মঘাতী, অন্যদিকে ওখানকার পাঠকদের জন্যে বেশ আরামদায়ক। কারণ, তাদের আর বাংলাদেশের কবিতা পড়তে হবে না। সম্পাদকীয় শেষ করতে গিয়ে রণজিৎ দাশ বলেছেন, 'আমি চেয়েছিলাম বাংলাদেশের কবিতার একটি নির্ভরযোগ্য সংকলন সম্পাদনা করার তৃপ্তি, পেয়ে গেলাম বাংলাদেশের হৃদয় আবিষ্কারের আনন্দ! সুতরাং এই সংকলন-কর্মে আমার চেয়ে সুখী আর কে?' অথচ তিনি কিন্তু বাংলাদেশের বিশেষ করে আশি ও নব্বই-এর কবিদের সম্পর্কে তেমন কিছুই জানেন না। কাজেই তার এরূপ ভাষণ ডাহা মিথ্যা।

'একটি নির্ভরযোগ্য সংকলন' সম্পাদনা করে তিনি তৃপ্ত, পাঠকরাও তা পড়ে 'তৃপ্ত' হবেন নিশ্চয়। সঙ্গে 'বাংলাদেশের হৃদয় আবিষ্কারের আনন্দ'ও মিলছে! এই আবেগ-প্রকাশে আছে কপটতা; সম্পাদকীয়টির অধিকাংশ জায়গায় আছে কপটতা– যে-সব উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে বাংলাদেশের কবিতার প্রশংসা করতে গিয়ে, অধিকাংশই নিম্নমানের। এটা যদি কপটতার নমুনা না হয়, তা হলে বলা অসঙ্গত নয় যে, রণজিৎ দাশের কাব্যবোধে গোলমাল আছে। নিম্নমানের কাব্যবোধ থাকলেই নিম্নমানের উদ্ধৃতি দেয়া সম্ভব। আলোচ্য সঙ্কলনে এমন অনেক রচনা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, যেগুলো কবিতাই নয়। এক সময় এগুলো কবিতা ছিল, ভাষার গতিশীলতার সঙ্গে টিকতে পারেনি বলে নিরীহ পদ্যে রূপ নিয়েছে। বাতিল হওয়া কবিতা কখনও-কখনও স্থান পেতে পারে এধরনের সঙ্কলনে, কবিতার বিবর্তন বোঝানোর জন্যে। দেশবিভাগের বেশ আগে *ধূসর পাণ্ডুলিপি* থেকে কবিতার চেহারায় বদল ঘটতে থাকে। পরিবর্তনের এই ধারা পূর্ববঙ্গের কবিতায়ও সঞ্চারিত হয়েছিল। বদল-ঘটা চেহারায় যে কবিতা লিখতে হবে এমন নয়; কিন্তু রবীন্দ্রকাল শেষ হওয়ার পর পুনরায় সেই কালের অনুগামী হওয়ার মধ্যে প্রতিভার কিছু নেই।

যদি প্রশ্ন ওঠে, রাজনীতিতে দুই সম্পাদকের মধ্যে কে বেশি ধূর্ত ও সফল? এর তাৎক্ষণিক উত্তর হতে পারে– 'ঢাকার কবি'। গ্রাম্য রাজনীতির মতো এই সাফল্য স্থূলতায় পূর্ণ। যেমন, জীবিতদের মধ্য থেকে তিনি যাঁদের কবিতা সঙ্কলনটিতে অন্তর্ভুক্ত করেছেন, 'ঢাকা'র সাহিত্য নিয়ে যারা কিঞ্চিৎ খোঁজখবর রাখেন, তাঁরা এই স্থূলতাটা ধরতে পারবেন। যেমন, কামরুজ্জামান কামু এ-পর্যন্ত সাকুল্যে যে-দু'টি ভালো কবিতা লিখেছেন সে-দুটি তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতা; কিন্তু বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ কবিতা ওগুলো হতে পারে না। শুরু থেকেই সাজ্জাদ শরিফ তাঁকে মহাকাব্যিক স্বীকৃতি দিয়ে আসছেন বলে তাঁর কবিতা বাংলাদেশে 'শ্রেষ্ঠ'। এরকম অনেক 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' সঙ্কলনটিতে রয়েছে, যেগুলো শরিফ ও ওই কবিদের জন্যে শ্রেষ্ঠ, বাংলাদেশের জন্যে নয়। যদি তা হয়, এটা মনে করা অবধারিত হয়ে পড়ে যে, বাংলাদেশের কবিতার অবস্থা খুবই মর্মান্তিক। স্থূল

রাজনীতির সাফল্য কতটা বিপজ্জনক, সেটাও আমাদেরকেই হয়তো প্রত্যক্ষ করতে হবে শিগগীরই। তখন হাসি আসলে তা-ও চেপে রাখতে হবে যেমন এই সংকলনটি দেখে হাসি পায় কিন্তু হাসতে পারি না এই ভেবে যে, সাজ্জাদ শরিফের পক্ষে গ্রহণযোগ্য একটি সংকলন করার সুযোগ ছিল যে সুযোগ তিনি কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয়েছেন। হাসির পরিবর্তে তাই কষ্ট হয় এজন্য যে সবাইকে যদি এভাবে নির্বুদ্ধিতা, প্রলোভন আর তাৎক্ষণিকতা দখল করে নেয় তাহলে আমাদের জাতীয় এমনকি আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব কোথা থেকে তৈরি হবে? তারেক জিয়া যেমন নেতা সাজ্জাদ শরিফকে সেই মানের সম্পাদক মনে হল এই সংকলনটি দেখে; অথচ দুজনেরই হয়তো দুইভাবে সুযোগ এসেছিল যেন!

স্থূলতার একটি উৎকট নমুনা হল, সম্পাদক নিজের নয়টি কবিতা এ-বইয়ে অন্তর্ভুক্ত করেছেন (সারা জীবনে তিনি ছাব্বিশটি কবিতা লিখেছেন)। অথচ আবুল হাসানের কবিতা রাখা হয়েছে

আটটি, হুমায়ুন আজাদের মাত্র পাঁচটি! আবার ফরহাদ মজহারের বারোটি কবিতা গ্রহণ করা হয়েছে! আমি সম্পাদক হলে ওই গ্রন্থে নিজের কবিতাই রাখতাম না। সেখানে সারা জীবনে ছাব্বিশটি কবিতা লিখে নয়টিই নিজের করা সংকলনে স্থান পেয়ে যায়, তাহলে শামসুর রাহমানের সারা জীবনের লিখিত কবিতার সংখ্যা ও মানের অনুপাতে অন্তত শ-খানেক কবিতা এই সংকলনে থাকার কথা ছিল! একটা কথা আঠারো বছর ধরে বলে আসছি, সাহিত্য সমালোচনাগুলো পড়লে বোঝা যায়, কে কার শত্রু কিংবা আত্মীয়। চর দখলের পর্যায়ে চলে গেছে এখানকার সাহিত্য।

দখলের কাজে লোকবল লাগে; সাজ্জাদ শরিফ বাংলা কবিতার চর দখলের জন্যে লোকবল সংগ্রহ করেছেন *বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ কবিতায়*। ফলে, বইটি একটি দখলি সংগঠনে পরিণত হয়েছে। অথবা সংগঠনটি আগে থেকেই ছিল ঘাপটি মেরে; এখন ঝোপ থেকে বেরিয়ে পড়েছে! ঘাপটি মেরে থাকার কথা তার কাছের কেউ কেউ হয়তো জানতেনও। অবশ্য এধরনের সংকলনের কারণে বাংলা কবিতার কিছুই যায় আসে না; কারণ সঙ্কলনটি সাহিত্যের কোনও কাজেই লাগবে না। এর কোনও গ্রহণযোগ্যতা নেই; ঠাঁই-পাওয়া কবিদের কাছে তা থাকতে পারে, পশ্চিমবঙ্গের পাঠকদের কাছে হয়তো থাকতে পারে বেশি; কিন্তু তাদের বিবেচনাবোধ দিয়ে এখানকার সাহিত্য রচিত হয় না, কোনও কালে তা হয়নি।

সঙ্কলনটির সবচেয়ে দুর্বল অংশ এর শেষ দিককার কবিতাগুলো। বাংলাদেশের নব্বইয়ের দশকের কবিদের হাতে রচিত কবিতা (দু'তিনটি বাদে) কত বাজে হতে পারে, তা বুঝিয়ে দেয়ার প্রকল্পটি এ-বইয়ে সফল হয়েছে বলে ধরে নেয়া যায়। আশির দশকের অধিকাংশ কবির একটা পরিচিত বাতিক হল, নব্বইয়ের কবিতার প্রতি তাচ্ছিল্য দেখানো। আলোচ্য সঙ্কলন তাঁদের এই বাতিককে বৈধ করে তোলার রসদ

দেবে বলে মনে হয়। যদিও সত্য হল, আশির কবিদের অনেকেই নব্বইয়ের কবিতার অনুকরণে লিখে চলেছেন।

চার

প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক, সঙ্কলনটির সমালোচনা কেন আমি করছি? এর জবাবও সঙ্গত, নিজের কবিতা সঙ্কলনে স্থান পায়নি বলে এই কাজে ব্যস্ত হয়েছি। *গোলাঘর* সম্পাদক যখন আমাকে বইটির সমালোচনা লিখতে অনুরোধ করেন, কথাটা তাঁকে আমি বলি। তিনি আমাকে পরামর্শ দেন যে, কাউকে-না-কাউকে কাজটি তো করতে হবে এবং তাতে এই প্রশ্ন অবধারিত; কিন্তু এ-রকম একটা সঙ্কলনের বিরুদ্ধে অবস্থান না-নিলে ভবিষ্যতে এই নীরবতা নিয়ে প্রশ্ন উঠবে; তখন এর জবাব পাওয়া গেলেও সেটি যথাযথ ও সময়োচিত না-ও হতে পারে। নীরবতা কখনও-কখনও সমর্থনের সমার্থক; সেটি আপোষকামিতারও জানান দেয়। সাহিত্যে দস্যুতার যে সর্বব্যাপী সংস্কৃতি দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে এদেশে, এর কারণ আমাদের পূর্বসূরিদের নীরবতা; কিন্তু এটি আরও

দীর্ঘ হলে নেমে আসতে পারে বিপর্যয়। তাতে সাহিত্যের কিছু আসে যায় না; কিন্তু দীর্ঘকাল পাঠকরা বিভ্রান্ত হতে থাকলে সেটি এক সময় হয়ে ওঠে সত্য। আলোচ্য সমালোচনাটি সেই শঙ্কারই থেকেই।

সঙ্কলনটি পড়ে আমার মনে হয়েছে, সাহিত্যে এর চেয়ে ভয়ঙ্কর জোচ্চুরি ও দস্যুতা আর কিছু হতে পারে না। কপটতা, ধাপ্পাবাজি, বদমায়েশির এই নমুনা হয়তো দেখা যায়-নি কখনও। সঙ্কলনটিতে নিজের কবিতা থাকলে আমি লজ্জা বোধ করতাম। লিখে তা জানিয়েও দিতাম। সাহিত্যের সূত্রে যাঁদের সঙ্গে আমার পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা হয়েছে, তাঁরা হয়তো জানেন, নিজের কবিতা প্রকাশের জন্যে আমি ব্যাকুল নই। নিজের বই প্রকাশ পেলে, দেখেছি, কিছু কবি পত্রিকা থেকে পত্রিকায় দৌড়ান। সে-রকম মাঠকর্ম আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। সুতরাংকেউ যদি ভাবেন, নিজের কবিতা ঠাঁই পায়নি বলে সঙ্কলনটি আমার সমালোচনার বস্তু হয়েছে, তাতে কিছু যায়-আসে না।

প্র কা শি ত হ য়ে ছে

....

মোহাম্মদ শাকেরউল্লাহ সম্পাদিত

ঊষালোকে

‘পদ্মার পলিদ্বীপ’ নিয়ে

নব পর্যায় পঞ্চম সংখ্যা এপ্রিল-জুন ২০০৯

স ং গ্র হ   ক রু ন

যতীন সরকার (১৯৩৬)-এর প্রকাশিত কয়েকটি বই

বইয়ের নাম	ধরন	প্রকাশকাল
সাহিত্যের কাছে প্রত্যাশা	প্রবন্ধ গবেষণা	১৯৮৫
বাংলাদেশের কবিগান	প্রবন্ধ গবেষণা	১৯৮৬
বাঙালির সমাজতান্ত্রিক ঐতিহ্য	প্রবন্ধ গবেষণা	১৯৮৬
সংস্কৃতির সংগ্রাম	প্রবন্ধ গবেষণা	....
বানবমন, মানবধর্ম ও সমাজবিপ্লব	প্রবন্ধ গবেষণা	....
ধর্মতন্ত্রী মৌলবাদের ভূত-ভবিষ্যত	প্রবন্ধ গবেষণা	২০০৯
পাকিস্তানের জন্মমৃত্যু-দর্শন	প্রবন্ধ গবেষণা	দ্বিতীয় মূদ্রণ ২০০৮
ভাষা সংস্কৃতি উৎসব নিয়ে ভাবনা চিন্তা	প্রবন্ধ গবেষণা	২০০৯
নির্বাচিত প্রবন্ধ	প্রবন্ধ গবেষণা	২০০৮
কেদারনাথ মজুমদার	জীবনী	১৯৮৭
সিরাজুদ্দিন কাসিমপুরী	জীবনী	১৯৮৮
হরিচরণ আচার্য	জীবনী	১৯৮৯
য়চন্দ্র কুমার দে	জীবনী	১৯৯০
গল্পে গল্পে ব্যাকরণ	কিশোর গ্রন্থ	১৯৯৪
রবীন্দ্রনাথের সোনার তরী	সম্পাদনা	১৯৮৬
জালালগীতিকা সমগ্র	সম্পাদনা	২০০৬
প্রসঙ্গ মৌলবাদ	সম্পাদনা	২০০৫